পরমাত্মার চোখ

নিগূঢ়ানন্দ

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

এ কাহিনী একটি সত্যিকারের কাহিনী। বাস্তব জগতের ঊর্ধ্বেও যে কিছু আছে তার প্রমাণ। এ কাহিনী যিনি লিখেছেন তিনি বিশেষ ধরনের যোগ সাধনা করেছেন। তাঁর সেই যোগ সাধনার পদ্ধতি যে নির্ভুল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে পরিশিষ্টে দেওয়া তাঁর গ্রন্থ পড়ে দেশবিদেশের পাঠক-পাঠিকার পাঠানো কিছু চিঠিতে। লেখক তাঁর গ্রন্থে যে যোগ নির্দেশ করেছেন সেই নির্দেশ অনুসারে ধ্যান করে তাঁরা যে ফল পেয়েছেন তার স্বীকৃতি। এঁরা কেউই (একমাত্র আমেরিকান সাহেব ছাড়া) লেখকের পরিচিত নন। এযে রীতিমত কৌতূহল উদ্দীপক সন্দেহ নেই। সংশয়াকুল বর্তমান আর্তবিশ্বে এ গ্রন্থ যদি এতটুকু নির্ভরতা মানুষকে দিতে পারে তবে এ প্রকাশকে সার্থক মনে করব।

প্রকাশক

অরূপের রূপের পায়ে

এই লেখকের অন্যান্য অধ্যাত্ম গ্রন্থ

সাধুসন্তের দেশে

আত্মার রহস্য সন্ধানে

সহস্রারের পথে

প্রাণ মন আত্মা

মৃত্যু ও পরলোক

সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে (১ম—৫ম খণ্ড)

মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে

দিব্য জগৎ ও দৈবী-ভাষা (১ম, ২য়)

জন্মান্তর

আত্মা মৃত্যু স্বর্গ নরক

দেবদেবীর উৎস সন্ধানে

জাতিস্মর

ঈশ্বর সন্ধানে ভারত

চল মন বৃন্দাবন

আত্মা ও পরমাত্মা

খুঁজে ফিরি কুণ্ডলিনী

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমার অধ্যাপনার জীবন শেষ হচ্ছে। ৬০ বছরে পড়ছি। একমাত্র সন্তান এখনও অধ্যয়নরত। বেরোজগারী প্রথম জীবনে সেই ১৯১৮ সালে অধ্যাপনা আরম্ভ করেছিলুম হাওড়ার একটি কলেজে। মাহিনা ১৮৬'২০ নঃ প। এখন? তা মাহিনা হিসেবে ভাল। কিন্তু তখন সেই সামান্যতেই ছিল মনের মধ্যে যে উদ্দীপনা আজ তা নেই। সামনে বিপুল অন্ধকার। ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছি। কারণ? কারণ, বাধ্যতামূলক ভাবে পেনশন নিতে হবে। কিন্তু পেনশন পাব কি? আমার সহধর্মিনী তিন বছর স্বেচ্ছায় স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দিলেও —আজও পেনশন পাননি। না পাওয়ার কারণ সমগ্র ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

স্বাধীনতা লাভে উৎসাহ ছিল লোকের মনে। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি ছিল যাঁরা রাজনীতি করতেন তাঁদের। সেই দুষ্টবুদ্ধির বীজ আজ মহীরুহ হয়ে গাঢ় অন্ধকারের ছায়া ফেলেছে। আমাদের সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা সার্থক। We have socialised corruption. আজ মস্তিষ্ক থেকে পাদাঙ্গুল—কোথাও আর বাকী নেই দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়তে। আজ কোথায় দুর্নীতিপরায়ণ লোক রয়েছে, চোর রয়েছে, বদমাস রয়েছে— দূরবীন দিয়ে তা খুঁজতে হয় না। একটি সৎ লোকও আছে কিনা সেটাই হল অন্বেষার বিষয়।

আমাদের স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার নিট ফল—আশাপূর্ণাদেবীর গল্প : এক ছিলেন রাজা। আফিং খেতেন। আফিংয়ে আর নেশা হয় না। রাজা অনুসন্ধান শুরু করলেন। দেখা গেল রাজার আফিং খাওয়া দেখে রাণীরও লোভ হল। আফিংয়ে ভাগ বসালেন। অর্ধেক আফিং তুলে নিয়ে তেঁতুল দিয়ে ভর্তি করে দিলেন। প্রাসাদের যে প্রহরী বহুদিন অন্দরমহলে আফিং পাঠাতে পাঠাতে লোভে পড়ে সেও একটু আধটু নেশা করতে

লাগল। সুতরাং অন্দর মহলে যা যেতে লাগল তা অর্ধেক আফিং অর্ধেক তেঁতুল। কালে কালে সাপ্লাই ডিপো থেকে ভেজাল শুরু হল। আফিংয়ে তেঁতুল পড়তে পড়তে অবস্থা দাঁড়াল এই যে, রাজার ভাগ্যে শুধু তেঁতুল। নেশা আর হয় না। সবটা যখন ধরা পড়ল রাজা মন্ত্রীকে বললেন— গর্ত খোঁড়। গর্ত হল। গর্তে কাঁটা ফেলা হল। মন্ত্রী ভাবলেন সবকটা জোচ্চারকেই রাজা ঐ গর্তে ঢুকিয়ে জ্যান্ত কবর দেবেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! রাজা হুকুম করলেন, 'ব্যাটা মন্ত্রীকেই ফেল গর্তে। ওকে জ্যান্ত কবর দাও। রাজ্যে এত বুদ্ধিমান ব্যক্তি থাকতে কিনা ওর মত গবেটকে করেছি মন্ত্রী!'

আজকের হাল তাই। চোর ধরবে কে? চোরের হাতেই ধরা পড়ছে সজ্জন। সনাতন সংস্কৃতির কী অপূর্ব পরিণতি!

গৃহিণীর পেনশনের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল—শিক্ষা বিভাগ পেনশনের ব্যবস্থা করতে হয় কি ভাবে তাই জানে না। সেই জন্য কোন্ টেবিলে ফাইল পড়ে তো ফাইল নড়ে না। শেষ পর্যন্ত নিজেরা করে দেবার প্রতিশ্রুতিতে সার্ভিস বুক ঠিক করা গেল। কিন্তু পেনশন সেলে আসার আগে শিক্ষা বিভাগ ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন একটি ভুল করলেন যাতে পেনশন সেল থেকে সার্ভিস বুক ফিরে আসে। এলও তাই। তারপর স্থানুর মত অচল সার্ভিস বুক, নড়েও না, চড়েও না। বললে নাড়াতে গেলে দক্ষিণা লাগবে এক হাজার। অভিযোগ করে দুষ্ট কর্মচারীকে হটানো গেল বটে কিন্তু সার্ভিস বুকের চারটে ঠ্যাং গজায়নি। আসলে সে চিরকালই পঙ্গু হয়ে থাকবে কিনা—ঈশ্বরও বোধ হয় জানে না! হয়তো রজতচক্র না পেলে সে চলবেই না।

ধন্য ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা। জাতীয় আয়ের এত কম অংশ বোধ হয় অন্য কোন দেশে শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় না। আগে তো শিক্ষকরা ছিলেন অভুক্ত। এখন দু'গ্রাস অন্ন মুখে দেবার ব্যবস্থা হলেও ফ্যাকড়াও কম নেই। ইনকাম ট্যাক্স হাঁ করে বসে আছে—ভাগ দাও। হড়ে গড়ে শিক্ষকের অবস্থা তাই নুন আনতে পান্তা ফুরাবার মত।

ধন্য ভারতবর্ষের আয়কর ব্যবস্থা। কোটিপতি ব্যবসায়ীর যদি পাঁচ টাকা ট্যাক্স হয় ৫ হাজার টাকা ইনকামের শিক্ষকের হয় ৬ কি ৭ হাজার টাকা। উকিলের জন্য, ডাক্তারের জন্য, 'ঘর সাজানো ব্যয়' আয়কর বাদ। 'বই কেনার ব্যয়' আয়কর বাদ। 'পায়খানা সাজাবার ব্যয়' আয়কর বাদ, কিন্তু শিক্ষক যদি বই কেনেন সেটি আয়করমুক্ত হবে না। বলে, একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ডিডাকশন তো দিয়েছিই।

বিচিত্র এই দেশ—যারা ঝুরি ঝুরি সন্তান দিয়ে দেশকে শ্বাস চেপে মারছে, তাদের জন্য সরকারের দাক্ষিণ্য অবারিত। যে ব্যাটা বিয়ে করল না তাকে দিতে হবে বড় রকমের ট্যাক্সো। অবিবাহিত থাকার গুণাগারী। এক ছেলের বাবা চাকরি পাবে না, বিশ ছেলের বাবার সন্তানদের জন্য চাকরি থাকে জমা। অধিক সন্তানের পিতা হয় মুখ্যমন্ত্রী। ওদিকে রেডিও টি. ভি.-তে বিজ্ঞাপনের অন্ত নেই—পরিবার পরিকল্পনা। হিপোক্র্যাট আর কাকে বলে!

এ-সব পড়ে যেন পাঠক ঘাব্‌ড়ে যাবেন না। ঈশ্বরের চোখে এত ছোট জিনিষ তো পড়ে না! ঈশ্বরীয় কথায় এ-সব তো অবান্তর। এ-সব আবার কেন? না না। আমি রাজনীতি করছি না, অতিবাস্তবতাও করছি না। সেই ঈশ্বরের যথার্থ জগতেই আসব। একটু ভূমিকা প্রয়োজন।

শিক্ষকের জন্য অনেকদিন ছিল বুনো রামনাথ। এখন তো তারা পাঁচ সাত হাজারী মনসবদার। রামনাথ এখন আর নেই। নব ভারতের নতুন ধনিক শ্রেণী শিক্ষক। সুতরাং লাগো তাদের পেছনে। নিউ বুর্জোয়া। দারুন সার্কুলার সরকারের, দারুন চোখরাঙানী সমাজের, শিক্ষকের আলাদা করে ছাত্র পড়ানো চলবে না—যাকে বলে টিউশনি।

বাড়ি ভাড়া দিয়ে, আয়কর দিয়ে পাঁচ হাজারী মনসবদারের থাকে কত? তিন কি চার? ধরুন একটি বা দুটি সন্তান আছে, ১৫০০ টাকা বাড়ি ভাড়া আছে। বছরের ধুতি কেনার পয়সা নেই।

সরকারী চাকুরের উপরি পাওনার অনেক পথ। বাড়ি করলে লোনের

ব্যবস্থা। অবসর নিলে পেনশনের নিশ্চিত আশ্বাস। শিক্ষকের ঘরটি করে দেবে কে? আকাশ ফুঁড়ে টাকা আসবে? রাজকর্মচারী চুরি করলে দোষ নেই। Overtime করলে অপরাধ নেই। শিক্ষক শিক্ষকতা করলে দেশ গেলো! করবে না কি মরবে? আমরা যারা টিউশনি করি না তাঁরা যেমন মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলতে দেখছি এক বছর আগে থাকতে, তেমনই করে মৃত্যুর পরোয়ানা পাঠ করবে? নিন্দুকেরা বলেন, শিক্ষক যদি মন্ত্রী হন, মন্ত্রীর মাইনে পান। আগে যদি এম. পি. হয়ে থাকেন এম. পি-র পেনশন পান। এম. এল. এ. হয়ে থাকলে তারও পেনশন। অধ্যাপকের পেনশনের অনুমোদন পান পনের দিনে। পেনশন বিলম্বিত কোন শিক্ষকের দাবিকে যদি তিনি 'অর্বাচীন দাবি' বলে চোখ রাঙান সেটা শোভা পায় বইকি! আগে যিনি শিক্ষক আন্দোলন করতেন, পরে মন্ত্রী হলে তাঁর ভোলটাই যায় প্যাল্টে। এটা যে ইচ্ছাকৃত ভাবে সবাই করেন তা নয়। আসলে ভারতীয় রাজনীতির নৈতিকতা এতটাই নিচে নেমেছে যে, মনুষ্যত্বের স্থান সেখানে হবারই কোন উপায় নেই। বিবেকের একটু তাড়না যাঁদের থাকে তাঁরাই তাই বলতে বাধ্য হন— আগে ছিলুম পাণ্ডা, এখন হয়েছি বিগ্রহ। কি করব বলুন? কোন বিগ্রহ কি পাণ্ডার কথা, পূজারীর কথা, ভক্তের আকুল প্রার্থনা শোনে?

কিন্তু শোনে। শোনে যে সেকথাটা বলব বলেই তো এতবড় অবতারণা! 'গরীবের রক্ত যে অশ্রু ঝরে হে ভগবান দেখেও দেখ না।' এ কথাটা সত্য নয়। Vallejo যখন বলেন—

'My God if you had been a man
to day you would know how to be god,
but you who have always lived well,
feel nothing of your creation.'

তখনও আমি এক মত নই। গরীবের চোখে যে রক্ত ঝরে ঈশ্বর তা দেখেন। তার সৃষ্টির প্রতি তিনি উদাসীন নন। মধ্যযুগে কবি আমীর খসরু দারিদ্র্যের যন্ত্রণা জানতেন। তাই বলেছিছেন— 'Every pearl

in the royal crown is but a crystallied drop of blood fallen from the tearful eyes of poor peasants. কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন নি। সত্যিই গরীবের চোখের জলে যে রক্ত ঝরে ঈশ্বর তা দেখেন। তাঁর সৃষ্টির প্রতি তিনি উদাসীন নন। কখনও যে তিনি দেখতে বিলম্ব করেন—তা মানুষের চোখের জলে যে রক্ত ঝরে সেই রক্তে লাল পতাকা ওড়াবার জন্য। ঈশ্বর রূপ ধরে এসে সামনে দাঁড়ান না। নারায়ণ নরনারায়ণের রূপ ধরেই আসেন। নিজের সৃষ্টির নিয়মের তিনি উল্লঙ্ঘন করেন না। সৃষ্টির নিয়মের সঙ্গে তাল মিলিয়েই তিনি কাজ করেন।

ঈশ্বর-মানস ও সীমিত ব্যক্তিমানস এক নয়। মৃত্যু যে দেহান্তর গমন এটা যিনি বোঝেন তিনি মৃত্যুতে দুঃখ করেন না। দুঃখ যে সুখেরই পথ—এটা যিনি বোঝেন তিনি দুঃখে দুঃখ করেন না। আসলে ঈশ্বরের বহু-মাত্রিক চেতনাকে ত্রিমাত্রিক চেতনা দিয়ে কখনই বোঝা যাবে না। এই বহুমাত্রিক চেতনা আসতে পারে অধ্যাত্ম পথের পথিক হলে, নইলে নির্ভেজাল আত্মসমর্পণে ঈশ্বরে নির্ভর করে। ঈশ্বরের চোখ সজাগ। ঈশ্বরের চেতনা সতর্ক। ভুল করার যে তাঁর উপায় নেই!

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস নাগাদ সত্যিই ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ি। যেহেতু কলেজের এটা হাল্কা সেশন। কোন রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিলাম। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাস থেকে চলার আর উপায় রইল না। হয় তো এই অসুস্থতা আমারই অপরাধে।

ঈশ্বরীয় পথের প্রথম পথিক হই ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। এক পরম যোগী পুরুষ আসেন হিমালয় থেকে, বলেন, পৃথিবী বিপর্যয়ের মুখে। ধ্বংস শিয়রে নাচছে। যদি মানুষকে বাঁচতে হয়—অধ্যাত্ম পথের পথিক হতে হবে। অধ্যাত্ম সাধনা সহজ নয়। ঐশ্বরিক জগতের সন্ধান সহজে লোকে পায় না। লোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু সেই ঐশ্বরিক বিশ্বাসে জোর নেই। না থাকার কারণ, এর তো কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ চাই, সরাসরি প্রমাণ। সেই প্রমাণের জন্য যোগশিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু

আধুনিক যুগে প্রাচীন যুগের মত সময় নেই মানুষের হাতে। সুতরাং সাধারণ মানুষের জন্যে সহজ যোগের সন্ধান চাই। সেই যোগ প্রচার করতে হবে অগণিত মানুষের কাছে। 'কিন্তু কী সে যোগ?' জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেননি। শুধু বলেছিলেন, 'এতকাল এই সহজ যোগের গূঢ় রহস্য লোকজ্ঞানের আড়ালে ছিল। এখন জগৎ হিতায়চ সেই যোগের গূঢ় তত্ত্ব মানুষকে দিতে হবে।'

'সেই গূঢ় তত্ত্ব কি? যোগের রহস্য কি?' জিজ্ঞসা করতেও তিনি কিছু বলেন নি।

আগে জানতুম না যে, মহাপুরুষদের মুখে শোনার প্রয়োজন নেই। তাঁদের সান্নিধ্যই যথেষ্ট। যা পাবার তাঁদের সান্নিধ্যেই পাওয়া। সেই যোগতত্ত্ব যে আমার অজ্ঞাতেই তিনি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন, জানিনি। প্রথম বুঝতে পারিনি বলে অধ্যাত্ম জগতের কোন চর্চাও করিনি।

কিন্তু ঘটনা ঘটতে লাগল বেশ অবাক করে দেবার মতই। এর পর থেকেই আমার জীবনে যা কখনও ঘটেনি তাই ঘটতে লাগল। অর্থাৎ অকারণে সাধু সমাগম। অকস্মাৎ অকস্মাৎ সাধু দর্শন হতে লাগল। প্রত্যেকেরই এক কথা—'একটু যোগ কর'। কিন্তু যোগ যে আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ কখনও করেছে এমন শুনিনি। ধার্মিক হয়তো ছিলেন বাবা কাকা সবাই। দুই জ্যেঠামশাই পূজা আহ্নিক না করে জল স্পর্শও করতেন না। বড় জ্যেঠামশাই তো স্বপাক খেতেন। শুধু আমার বাবা আর কাকা বাহ্য পূজার মধ্যে ছিলেন না। তবে তাঁদের দু'জনেরই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কণ্ঠস্থ ছিল। ছোটকাকা তো জগদীশ ঘোষের 'শ্রীকৃষ্ণ' নিয়েও পড়ে থাকতেন।

পূজা আর্চা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন আমার বালবিধবা পিসীমা। উলঙ্গ এক নাঙাসাধু ছিলেন তাঁর গুরু। তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন পিসিমাকে। পিসিমার বেদীতে ছত্রিশ কোটি দেবতার ছবি না থাকলেও অনেক দেবতার যে সহাবস্থান ছিল তাতে আর সন্দেহ কি। অথচ মূলতঃ

পিসিমা ছিলেন ৺কালী সাধিকা। সেজন্য গোপীনাথকে যে ধূপচন্দন কম করে দিতেন তা নয়। কিন্তু ধর্মগ্রন্থ পাঠের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থ ছিল 'শ্রীমদ্ভাগবত'। যোগের কথা কারো মুখেই শুনিনি। শুধু বাবার লাল মলাটের পকেট সাইজ গীতা উল্টেপাল্টে সেখানেই পেয়েছি 'যোগ' কথাটি—'সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ', 'ভক্তিযোগ' ইত্যাদি। কিন্তু যোগরহস্য কি সেটা জানিনি।

কী আশ্চর্য! পরে সবটাই কেমন সহজ ভাবে আয়ত্তে এসে যায়। শুধু এসে যায় না অভিনব কিছু চিন্তাও এর মধ্যে ঢুকে যায়, যে ধরনের চিন্তা ভারতীয় বাহ্য যোগ পদ্ধতির মধ্যে ছিল না—যেমন পতঞ্জলির যোগপদ্ধতি কিংবা তান্ত্রিক যোগ পদ্ধতি।

তাহলে কি পূর্বজন্মে এই যোগের অভিজ্ঞতা আমার ছিল? মৃত্যুর পর কিছু থাকে একথাই এখনও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লোকে বিশ্বাস করে না। যারা ঐতিহ্য অনুযায়ী ধর্মের প্রভাবে করে, তারাও যথার্থ করে কিনা সে বিষয়ে জোর করে বলা দায়। আসলে আমরা যে কী বিশ্বাস করি, করি না আমরা তা নিজেরাই জানি না।

ইদানিং অধিমনোবিজ্ঞানীয় চর্চায় দেখা গেছে বাহ্য-চেতনা অপেক্ষা অবচেতন-চেতনা অনেক বেশী ক্ষমতাশালী। সেই অবচেতন-চেতনা বা মানসই আমাদের পরিচালিত করে বলে অনেক সময়ই আমরা আমাদের নানা ধরনের বিচিত্র ব্যবহারে অবাক হই।

ভাবলে অবাক হতে হয় যে, আমাদের রোগ শোক, ব্যথা বেদনা, সবই নাকি নিজেদেরই অন্তরতমের বিচিত্র বাসনা থেকে জাত। ডঃ গ্রোডেকের মত চিকিৎসক বলেছেন—'মৃত্যুও ব্যক্তির অন্তরতমের নিজস্ব অভিলিপ্সা থেকে। সাময়িক মৃত্যুর পর জীবন ফিরে পেয়ে Betty J. Eadie বলেছেন যে, 'আমাদের রোগ আমরা নিজেরাই ডেকে আনি। কেউ কেউ মৃত্যু ডেকে আনেন ইহজীবনের অভিনয়ে ইতি টানবেন বলে।'[১]

১. To my surprise I saw that most of us had selected the ill-/

আসলে আমরা অনেক কিছুই করেছি বটে, আসল কাজের কাজ কিছুই করিনি। মহাবিশ্ব খুঁজে দেখার জন্য বহির্জগতে রকেট পাঠাচ্ছি, space craft পাঠাচ্ছি। কিন্তু নিজের বুকের ভেতরটাই খুঁজে দেখিনি। ওখানেই যে সমগ্র বিশ্বের ছায়া রয়েছে এটা অধিবিজ্ঞানীরা ইদানিং-কালে চর্চা করে তবেই তার সামান্য কিছু জানতে পেরেছেন। সমগ্র সৃষ্টি রহস্যই এই সামান্য মর্মের মধ্যে লেখা রয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা সম্মোহন বিদ্যা চর্চা করে তার সামান্য একটু জানতে পেরেছিলেন। সেই নিয়ে 'জাতিস্মর' গ্রন্থ লিখতে গিয়ে সত্যি সত্যিই চমকে গেছি। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিদও এখন এই আন্তরদুনিয়ার সামান্য হদিশ পেয়ে ধ্যানে বসেছেন।[১]

এই রহস্য ভারতীয়েরা বহু আগেই জানতেন বলে পুরাণ কাহিনীতে দুর্গা, গণেশ ও কার্তিকের কাহিনী লিখেছিলেন; ৺দুর্গা বললেন, যে আগে বিশ্ব ঘুরে এসে তাঁকে বলতে পারবে সেই শ্রেষ্ঠ। কার্তিক ময়ূরে করে বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ মাকে একবার প্রদক্ষিণ করে নমস্কার করলেন। কার্তিক ফিরে এসে দেখেন গণেশ উপস্থিত। লম্বোদর কি করে এত দ্রুত ঘুরে এলেন—কার্তিক ভেবেই পেলেন না। ৺দুর্গা বললেন গণেশই শ্রেষ্ঠ। গল্পের মূল কথা এই যে, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে আমাদেরই ঘরের কাছে। নিজের ভিতরটা ঘুরে দেখলে অনন্ত বিশ্বটাই ঘুরে দেখা হয়।

হয়তো পূর্বজন্মে আমি যোগ করতুম। সেইজন্য ঘটনাপ্রবাহে যোগের পথে যখন গেলুম—দেখলুম, শেখাবার প্রয়োজন হল না কাউকে। আপনিই যোগের প্রাপ্তিগুলো পেয়ে যেতে লাগলুম, চোখ বুজতে না বুজতেই।

সত্যিই কি 'সহজ যোগের' পদ্ধতি আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছিল আমারই পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা থেকে? না হিমালয়ের সেই সাধুটি দান করে গেলেন আমাকে? মুখে কিছু না বলে কি ভাবে ওঁরা দান করেন?

মহাকাশে নাকি তরঙ্গ বিনিময়ের কোন মাধ্যম নেই। ইথারের কল্পনা ভ্রান্তি মাত্র। মহাকাশচারীরা দেশে ভাসতে ভাসতে কথা বলতে গিয়ে দেখেছেন যে, সশব্দে সেখানে ভাব বিনিময় করা যাচ্ছে না। আমাদের শাব্দিক বাক্য সেখানে অকেজো। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করলে অপরের মনে তার সাড়া তোলা যাচ্ছে। সেইজন্য টেলিপ্যাথি চর্চা শুরু হয়েছে মানুষের ইতিহাসে মহাকাশ পর্যায়ের প্রস্তুতি হিসেবে! বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, ভিন্ন গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে এই টেলিপ্যাথির মাধ্যমেই ভাব বিনিময় করা যাবে। তাহলে কি হিমালয়ের সাধুটি টেলিপ্যাথির মাধ্যমে আমার অন্তরতম সত্তায় তাঁর যোগ পদ্ধতি দান করে গেলেন?

কিভাবে যে, কে কখন তার ব্যক্তিসত্তা অপরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় কে বলবে! বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, psychic healer-রা pk বা আত্মশক্তি প্রয়োগ করে অপরকে রোগমুক্ত করেন। এদের pk পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তা রুগীর এনজাইম সিস্টেমকে রীতিমত চাঙ্গা করে তুলছে। হিমালয়ের সেই যোগীর তেমনই কোন pk—আমার মধ্যে যোগপদ্ধতি সঞ্চার করে গিয়েছিল কিনা তা বলতে পারব না। তবে শেষ পর্যন্ত যে যোগপদ্ধতি আমি সহজ যোগের মধ্যে শিখেছি তাতে দেখা যায় ফ্রয়েডের মত মনস্তত্ত্ববিদের প্রভাবও তার উপর রয়েছে প্রচণ্ড।

যে যোগ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আমার মধ্য থেকে ফুটে উঠেছে, তার মূল কথা পাশ্চাত্যের স্বপ্নতত্ত্ব। স্বপ্ন মনের কারাগার থেকে নানা ভাবে আবদ্ধ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বের করে দিয়ে আমাদের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা-

গুলিকে পূরণ করে বলেই আমরা স্বাভাবিক থাকি। স্বপ্ন সেইজন্য ইচ্ছা পূরণ। তবে সে ইচ্ছা পূরণের বিচিত্র ধারা আমরা বুঝিই বা কজন? ফ্রয়েড তাঁর 'Interpretation of Dream'-এ স্বপ্ন 'ইচ্ছা পূরণ'-এ কথাই বলেছেন। এক মহিলা একথা শুনেই তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলেন। তিনি এক বিশ্রী ধরনের স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্ন হল — তার একমাত্র সন্তান মারা গেছে। কেউ কি এ ধরনের ইচ্ছাও করতে পারে?

ফ্রয়েড কেস হিস্ট্রি নিয়ে দেখলেন, মহিলাটির প্রথম জীবনে এক প্রণয়ী ছিল। বহুদিন তাকে দেখেন নি। চিঠিপত্র লিখেও কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে অদ্ভুত এক চিন্তা করেন — "তাঁর একমাত্র ছেলে মারা গেলেও কি সে দেখতে আসবে না।" সেই তার গোপন ইচ্ছাই স্বপ্ন রূপে ভেসে ওঠেছে। স্বপ্ন সত্যিই ইচ্ছা পূরণ। যাদের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, অর্থাৎ যারা স্বপ্ন দেখেন না, দেখা গেছে তারা অল্প দিনের মধ্যেই পাগল হয়ে যান।

কিন্তু স্বপ্ন দেখলেই যে, মনের কারাগার থেকে সকল অবদমিত আকাঙ্ক্ষা মুক্তি পায়, তা নয়। আরও অনেক তখনও থেকে যায়। চুপ করে বসে থাকলে সে-সবই মন থেকে বেরুতে থাকে। এই ভাবে মনের কারাগার থেকে অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বের করে দিতে পারলে সত্যি মন হাল্কা হয়। মন তখন সহজে বিচলিত হয় না। সুতরাং সহজ যোগের যে চিত্রটি আমার কাছে এল, তা হল এই যে, চুপ করে সামনের দিকে মনকে ফেলে রেখে বসে যাক। কিছু দেখবার চেষ্টা কোরো না। যা মনে আসে আসতে দাও। দেখবে কিছু দিনের মধ্যেই মনের চোখে কত কিছু ফুটে উঠছে। ঐ যে চিরাচরিত যোগ নির্দেশ, তা তেমন কার্যকর নয়। বরং দর্শনে বিলম্ব ঘটায়। মনের গলদ বের না হলে অন্তরতম স্বচ্ছ জলাশয় অবদমিত কচুরিপানার আবর্জনায় ঢাকা পড়ে থাকে। আকাশের ছায়া সেখানে পড়ে না।

এই হল যোগের মূল কথা। সেইজন্য ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস থেকে ভারতে যোগ শিখতে আসা মিসেস রেনে ও তাঁর সেক্রেটারি

জিম ক্রাচফিল্ড যখন লেখকের সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব দেন যে, হিন্দু হতে চান, হিন্দু যোগপদ্ধতি শিখতে চান, লেখক বলেছিলেন, যোগ শেখার জন্য নিজের ধর্ম ত্যাগ করার কোন কারণ নেই। হিন্দুধর্মের মূল লক্ষ্য সত্য। প্রত্যেক ধর্মেরই মূল লক্ষ্য একই। সত্যজ্ঞানীই হিন্দু। বাহ্য আচারে পৈতে, টিকি, চতুর্বর্ণ ও আশ্রম অনুসরণ করে যাগযজ্ঞ করলেই হিন্দু হওয়া যায় না। ওঁ উচ্চারণ করলেও হিন্দু হয় না। গায়ত্রী মন্ত্র জপই হিন্দুত্বের পরিচয় নয়। যখনই কেউ সত্যকে জানবে তখনই হবে হিন্দু।

জিম ক্রাচফিল্ড কিন্তু সহজ এই যোগপদ্ধতি অনুসরণ করেই বহু যোগদর্শন করে ফিরে গেছেন।[১]

এই সহজ যোগ, কি ভাবে কেমন করে আমার মধ্যে এসেছিল অনেক কিছু জেনেও যথার্থ ভাবে তা জানি না। কিন্তু এসেছিল এবং উত্তরোত্তর যোগের ধারণাগুলিকে নানা ভাবেই বলিষ্ঠ করেছিল। আমার সকল ধর্মগ্রন্থে সেই চর্চিত অভিজ্ঞতার কথাই আমি আলোচনা করেছি। কোন একটি বইয়েতে সেইজন্য এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার সবটুকু নেই। অন্তরের আকাশ থেকে চুঁইয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জলের মত তা পুকুর সৃষ্টি করেছে। আসলে আমার লেখা আমারই ক্রম-উত্তোরণ। যার মূল সূত্র রয়েছে 'দিব্য জগৎ দৈবী ভাষা'তে। তা ডাল-পালা ছড়িয়ে ক্রমশঃ বড় হচ্ছে অন্যান্য গ্রন্থে। ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্ট নির্দেশিত যোগ পদ্ধতি অনুসরণ করলে গুরুর প্রয়োজন নেই। সুদূর ইংল্যাণ্ডে বসেও সহজ যোগের বিচিত্র ফল পাওয়া যেতে পারে।[২]

১. পরিশিষ্টে জিম ক্রাচফিল্ডের চিঠিগুলি দেওয়া হল।

২. ইংল্যাণ্ড থেকে মঞ্জুলা গাঙ্গুলির চিঠি। দেশের ভেতররও কয়েকটি চিঠি

দুই

আমার প্রাক্তনের জন্যই হোক বা হিমালয়াগত সেই শক্তিধর যোগী পুরুষের জন্যই হোক, যোগ বোধহয় কিছু শিখেছিই। বছর দুয়েক যোগ করার পরই দেখি অনেক ঘটনা, কি ঘটছে দেখতে পাচ্ছি। যা দেখছি তা সত্যি কিনা পরখ করে দেখার জন্য যাদের দেখেছি তাদের কাছে গিয়ে মিলিয়ে নিয়ে দেখেছি মিথ্যে নয়। এ আমার কাছে সত্যি একটি চমকের মত ছিল। যদিও অধ্যাত্ম পুরুষেরা এ সবের কোন মূল্যই দেন না। এ-সব তাঁদের মতে পরম সিদ্ধি লাভের পথে অন্তরায়। আমি নিজে "ঘটনার তাৎক্ষণিক দর্শন"কে ঘটনার তরঙ্গপ্রবাহের সঙ্গে আমাদের নিজেদের তরঙ্গ প্রবাহের অর্থাৎ চিন্তার সমতালিক ফ্রিকোয়েন্সি বলে মনে করেছি। এবং সেভাবেই আমার "দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা" গ্রন্থে লিখেছি। কিন্তু এই তাৎক্ষণিক দর্শনের ক্ষেত্রে একটি জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি যে, দর্শনীয় ছবি বেশিক্ষণ মানসনেত্রের উপর থাকে না। কেন থাকে না একথা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নেতাজী নগর কলেজের অধ্যাপক ডঃ দিলীপ চক্রবর্তী। বেশিক্ষণ এই ছবি না থাকার কারণ হল তরঙ্গপ্রবাহের interference.

কিন্তু বিশেষ করে আমি চমকে গেছি সেইসব দৃশ্য দেখে, যে ঘটনা আগে ঘটে নি। যা ঘটবে তা আগে কি করে দেখা যায়—এটা আমার কাছে বিরাট একটি ধাঁধা ছিল। বাহ্যত সবটাই যেমন অবিশ্বাস্য। যদিও এর একটা ব্যাখ্যা আমি আমার 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে দিয়েছি তা কতটা লোকের কাছে গ্রাহ্য হবে জানি না।

এরকম ঘটনা পৃথিবীতে যে শুধু আমার ক্ষেত্রেই ঘটেছে, তা তো নয়! বহু অধ্যাত্মসাধক বা যোগীর ক্ষেত্রেই ঘটেছে। পাশ্চাত্যের বহু লোক, অধ্যাত্ম সাধনার অর্থে যাঁরা সাধনা করেন নি—তাঁদের মধ্যেও আছে

এ-ধরনের ক্ষমতা। আমরা যেমন প্রতিটি অতিপ্রাকৃত ঘটনাকেই ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করে বসে থাকি, ওঁরা তা করেন না। করেন না বলেই এর বিশ্লেষণ শুরু করেন। ঘটনার আগে এই ঘটনাদর্শনকে ওরা বলেন precognition. খুঁজে দেখবার চেষ্টা করলুম পাশ্চাত্য পূর্বাহ্ন দর্শনের ব্যাপারটা। এ সম্পর্কে প্রথম চিন্তা ভাবনা শুরু করেন রুশ অধ্যাপক I. Gellerstein. তিনি জীববিদ্যার উপর ডক্টরেট এবং পোপোভ ইনস্টি-টিউট-এর অধি মনোবিজ্ঞানী। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্বাহ্ন দর্শন বা precognition-এর প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তৃতা দেন। তাঁর মতে— মহাকাশচারীরা দেশের বুকে এত প্রচণ্ড বেগে ধাবমান হবেন যে, তাঁদের যথার্থ অর্থে ভাবদর্শনের ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। এই ক্ষমতার প্রয়োজন হবেই, কেননা জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করতে হলে, তা পূর্বাহ্নে জ্ঞাত না হলে বিপর্যয় এড়নো যাবে না। এটা দেখা গেছে যে, কিছু কিছু ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের ক্ষমতা আছে। রাসপুটিনের মধ্যেও ছিল। যদি কিছু লোকের মধ্যে এই ক্ষমতা থাকে, তবে আরও লোকের পক্ষে এধরনের ক্ষমতা আয়ত্ত করা অসম্ভব নয়। দেশের অপরিচিত পরিবেশে সত্যিই যদি মহাকাশ অভিযান চালাতে হয়, তাহলে এই আত্মিক ক্ষমতা মানুষকে অর্জন করতেই হবে।

এইজন্য মানুষের আত্মিক শক্তির রহস্য জানার উপরই তারা প্রথম জোর দেন। মানুষের আত্মিক শক্তি বিচিত্র রহস্যে ঘুরে বেড়ায়। দেখা যায়, কোন ফুটবল প্লেয়ার হয়তো তার পা হারিয়ে ফেলল অ্যাকসি-ডেন্টে। যে আত্মিক শক্তি তাকে ফুটবল প্লেয়ার করেছিল, সেই শক্তি খেলোয়াড় হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পেরে ভিন্ন পথে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল। দেখা গেল ফুটবল প্লেয়ার হয়েছেন বড় একজন পিয়ানোবাদক। এইজন্য জন্মতই যারা কতকগুলি স্বাভাবিক জৈব ক্ষমতা বঞ্চিত, যেমন, বধির এবং মূক, তাদের নিয়ে সোভিয়েত অধি মনোবিজ্ঞানী কুনি ও উল্‌ফ মেসিং পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। দেখা যায়, এদের চিন্তাতরঙ্গ ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রয়েছে প্রচণ্ড। কেন এই

ক্ষমতা, সেটা বুঝতে গিয়ে ওঁরা বুঝতে পারেন যে, তাদের স্বাভাবিক পঙ্গু জৈবিক ক্ষমতাকে পুষিয়ে দেবার জন্যই আত্মিক শক্তি নতুন ক্ষমতার আকারে প্রবাহিত হয়েছে। এই ক্ষমতাকেই বলে টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা।

এই ক্ষমতা অর্জনের জন্য সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে নির্দেশ দিয়েছে তা এই রকম ঃ মনের মধ্যে কোন বিষয়ের চিত্র বেশ জোর করে তুলে ধরে রাখার চেষ্টা করুন। বেশ আরাম করে বসুন। দুশ্চিন্তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন, যেমন করে ভেজা কাপড় শরীর থেকে খুলে ফেলেন। যে-কোন ভাবাবেগকেই বুক থেকে নামিয়ে দিন। আত্মবিশ্বাস আনুন। যখন মনের ছবি বাইরে কারো কাছে পাঠাবেন, মনের মধ্যে অন্য কোন ভাব আসতে দেবেন না। যে জিনেসের চিত্র দূরবর্তী কারো মানসনেত্রে পাঠাতে চান সেই বিষয়টিকে (যে-কোন জিনিস) স্পর্শ করুন। এতে আপনার ত্বকেন্দ্রিয়ে এক ধরনের ত্বকীয়বোধ (cutaneus representation) হবে। এবার মনের মধ্যেও ভাল করে বিষয়টিকে ভাবুন। যার কাছে বিষয়টির মানসতরঙ্গ পাঠাতে চান তার মুখটা নিজের মনের মধ্যে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করুন। মনে করুন উদ্দীষ্ট মুখটি প্রেরিত বিষয়টির ছবি দেখছে। শুধু দেখছে না, বিষয়টিকে স্পর্শও করছে। এতে দশ জনের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে অন্তত সাতজন অভীষ্ট ফল তো পাচ্ছেনই।

টেলিপ্যাথির উপর যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করে সোভিয়েত অধি মনোবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অপরের চিন্তাতরঙ্গের সমতালে নিজের চিন্তাতরঙ্গকে নিয়ে আসতে পারেন। এইজন্যই নিজেও তিনি দেখতে পান এবং অপরকেও দেখাতে পারেন।

এ বিষয়ে বর্তমান লেখক ক্যালিফোর্নিয়া আগত জিম ক্রাচফিল্ডের উপর পরীক্ষা করেছিলেন। জিম কয়েকমাস তাঁর কাছে সহজযোগ শিক্ষা করেন। অল্পদিনের মধ্যেই জ্যোতির একটি বিশেষ স্তরে তাঁর যাবার ক্ষমতা হয়েছিল। এসময়ে একদিন কানাডার এক তরুণ বন্ধুকে জিম তার

কাছে নিয়ে আসেন। তুদিন পরে আবার তাকে নিয়ে আসার কথা ছিল কিন্তু জিম একাই আসেন। লেখক জিজ্ঞাসা করতে জানতে পারেন যে, তার কানাডিয় বন্ধুটি অসুস্থ। লেখক চোখ বুজে দেখেন থাইল্যাণ্ডে থাকাকালে মহিলাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার জন্য সেই কানাডিয়টি যৌন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। জিমকে স্পর্শ করে তিনি সেই কানাডিয়ের বিশেষ অ্যাবডোমিনাল অঞ্চলটি লক্ষ্য করতে বলেন। জিম অল্প কিছু-ক্ষণের মধ্যেই দৃশ্য থেকে চমকে উঠেন—এ যে ভয়ানক রোগ! তাহলে উপায়?

—সেটা তোমরা যেমন ভাববে।

শুনেছি জিমরা আর কালবিলম্ব না করে তাকে ছেড়ে ক্যালিফোর্নিয়া চলে গিয়েছিল। প্লেনের টিকিট অবশ্য আগেই কাটা ছিল। সেইজন্য যাবার আগের দিন জিম আমার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারেনি।

এই যে আত্মিক শক্তি, যা তাৎক্ষণিক ভাব বিনিময় করাতে পারে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা—ESP (Extra Sensory Perception) তা বিশেষ বিশেষ শক্তিক্ষেত্র দ্বারাই উত্তেজিত হয়। তবে এই ফিল্ড সাধারণ-ভাবে পরিচিত ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড নয়। প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ সময়ও আমাদের মধ্যে আত্মশক্তি জাগরণে সহায়ক হতে পারে—যেমন মধ্যরাত্রি (এই জন্যই কি ভারতবর্ষে যোগীরা মধ্য রাত্রিতে বা নিস্তব্ধ ভোরে যোগ করতে ভালবাসেন? তান্ত্রিকেরা মধ্য রাতে তান্ত্রিক ক্রিয়া করেন?)। প্রকৃতির মধ্যে বিপর্যয় শুরু হলে যেমন, ঝড় বাদল ইত্যাদি আত্মশক্তি চর্চা আবার বিঘ্নিতও হয়।

সোভিয়েত অধি মনোবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, চলমান মানুষকে যেন একটি স্পন্দিত ফিল্ডের মত দেখায়। নিজের গতিময়তার মধ্যে সে অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগ সাধন করে। যেন তারের সুরতরঙ্গ, একটি সুর অপর সুরের সঙ্গে মিলে ছন্দময় সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করে—যাকে বলে symphony. এ থেকে জ্যোতিষবিদ্যা সম্পর্কেও তাদের আগ্রহ জন্মে গেছে। জন্মের সময় সূর্যের অবস্থানকে এখন তাঁরা

মূল্য দেন।[১] ওরা মনে করেন, টেলিপ্যাথিতে চিত্র বা ভাব গ্রহণ যাঁরা করতে পারেন তাঁরা সাধারণতঃ সূর্য যখন শান্ত থাকে, তখন জন্মান। সূর্যে কলঙ্ক (sun spot) দেখা দেবার সময় যাঁরা জন্মান তারা ভাল টেলিপ্যাথি চিত্রপ্রেরক হন। ডঃ কোনস্টানটিন কোবিজেব (Dr. Konstantin Kobyizev) এবং সোভিয়েত কসমিক বায়োলজির অগ্রদূত ডঃ এ. এল. চিজেভ্স্কি (Dr. A. L. Chijevsky) প্রমুখ বিজ্ঞানী পৃথিবীর বহু ঘটনার উপর সূর্যের অবস্থান্তরের প্রভাব ব্যক্ত করেছেন।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আত্মিক শক্তি তখনই তুঙ্গে উঠে যখন—সূর্যকলঙ্ক পৃথিবীর আবহাওয়ায় বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করে।[২] আত্মশক্তির উপর প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ অবস্থার এই প্রভাবের জন্যই সোভিয়েত মনোবিজ্ঞানীরা অনেক সময়ই দুপুর রাতে আত্মচর্চায় বসেন।

সোভিয়েত অধি মনোবিজ্ঞানীরা আরো পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, কারো চিন্তাতরঙ্গ উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই মাঝপথে অন্য কেউ ধরে নিতে পারে। পূর্বাহ্নকথন কি এই মাঝপথে টেলিপ্যাথি ধরার মত? নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুবার আগেই ধরে সেখানে পৌঁছে দেবার মত?

অনেক সময় স্বপ্নের ভেতরও পূর্বাহ্ন দর্শন হয়। যা ঘটতে যাচ্ছে আগেই অনেকে তা দেখে থাকেন। এরকম অভিজ্ঞতা কম বেশী অনেকেরই আছে। স্বপ্ন দেখার সময় কি মানসতরঙ্গ বহুমাত্রিক অবস্থার মধ্যে গিয়ে পৌঁছোয়? না হলে এমন সব অভিজ্ঞতা হয় কি করে? ইলেকট্রো এনসেফেলোগ্রাফ যন্ত্রে স্বপ্ন দেখা লোকের যে মানস তরঙ্গ ধরা পড়ে—তাতে কি বহুমাত্রিক অবস্থার কোন ইঙ্গিত মেলে? অধি মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

১. We mean solar activity at the time of person's birth.

—Edward Naumov.

২. The most favourable time for pk to occur is when there are magnetic disturbances of the earth caused by sun-spot activity. —Dr. Sergeyev.

দিনে দিনে বিশ্বরহস্যের যে-সব নতুন নতুন রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে তাতে আত্মশক্তিচর্চকগণ অধিমনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধান চালিয়ে যাবারই পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে তরলস্ফটিক অধিমনোবিজ্ঞানীদের বেশ চমকে দিয়েছে। কেউ যদি এই তরল স্ফটিকে দেহ সিক্ত করে, তখন দেহ থেকে নানা ধরনের আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়। এই আলোর চরিত্র বিচার করে যার দেহ থেকে এই আলো বেরোচ্ছে তার ভাবাবেগের চরিত্র নির্ধারণ করা যায়। ভবিষ্যতে এই তরল স্ফটিক যে অনেক কাজে লাগবে সে বিষয়ে অধিমনোবিজ্ঞানীরা নিশ্চিত।

পাখিরা নতুন দেশে জন্মালেও তাদের পিতা-মাতা সেখানে মারা গেলেও কী এক অলৌকিক শক্তিবলে যেন নিজেদের পিতৃভূমির গন্ধ পায় এবং হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে সেখানে ফিরে যায়। এই যে গন্ধ শুঁকে শুঁকে যাওয়া একেই অধিমনোবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন psi-trailing. সমুদ্রের নিচে ডুবো জাহাজে ইঁদুর রেখে ডাঙ্গায় তাদের বাচ্চাদের হত্যা করে দেখা গেছে যে, মা ইঁদুরগুলি তাতে কেমন বিচলিত হয়ে ওঠে। তা ছাড়া কিছু ইঁদুরকে হত্যা করা হবে এমন চিন্তা করলেই দেখা যাচ্ছে যন্ত্রে তাদের মস্তিষ্ক তরঙ্গে কেমন বিচলনের চিহ্ন ফুটে উঠছে অর্থাৎ তারা যেন এই নিষ্ঠুর ব্যাপারটিকে পূর্বেই অনুমান করতে পারছে। এ যে এক ধরনের precognition সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, চুম্বকত্বের এমন ক্ষমতা আছে যা যে-কোন মস্তিষ্কস্নায়ুকে প্রভাবিত করতে পারে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এখন বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন যে, মস্তিষ্কস্নায়ু থেকে বিশেষ এক ধরনের তরঙ্গ বেরয় যা-ই নাকি টেলিপ্যাথির জন্য দায়ী। এই তরঙ্গ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ নয়। এই তরঙ্গ এক ধরনের psi-field দ্বারা প্রক্ষেপিত হয়।

সময়েরও তারলিক ও ঘন অবস্থা আছে। টেলিপ্যাথিক সংকেত যারা পায় তাদের কাছে সময় বেশ ঘন হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক অবস্থা—যেমন

বজ্রপাত, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতির উপরও সময়ের ঘনত্ব নির্ভর করে।

চৈনিক আকুপাংচার ব্যবস্থার উপর কারো অধিকার জন্মালে রোগের ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নেই কতকগুলি ইঙ্গিত পেতে পারেন। আকুপাংচারে চর্ম আবরণের বিভিন্ন বিন্দুতে সূঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হলে দেহের মৌলশক্তি প্রবাহপথের নানা স্থানকে দুর্বলতা মুক্ত করা যায়। যেমন দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের শিরোভাগের নিচে মৌলশক্তি প্রবাহের এমন পথ আছে যা শক্তিকে হৃদপিণ্ডে নিয়ে যায়। কিরলিয়ান ছবিতে দেখা গেছে কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর এই শিরোভাগ প্রচণ্ড আলো বিকিরিত করছে। বর্ণের তীব্রতা ও আলো বিচ্ছুরণের যথার্থ ক্ষেত্র যদি নির্ভুল ভাবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে চিকিৎসকেরা হয়তো দেহের অভ্যন্তরের নানা জৈবযন্ত্রের যেমন প্যানক্রিয়াস বা মস্তিষ্কস্নায়ু সম্পর্কে কিরনিয়ান ছবি দেখে পূর্বাহ্নেই অনুমান করে নিতে পারবেন। নইলে প্রচলিত পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে এদের যথার্থ অবস্থা সম্পর্কে জানা আজও কষ্টসাধ্য। আকুপাংচার বিশারদেরা দেহের নানা বিন্দু থেকে অভ্যন্তরের দেহযন্ত্র সম্পর্কে বুঝতে পারেন। এই-জন্য চৈনিক চিকিৎসাক্ষেত্রে এই ধরনের প্রবাদ চালু আছে—'যারা বড় চিকিৎসক তারা রোগ বাইরে দেখা দেবার আগেই নিরাময় করেন। নিকৃষ্ট চিকিৎসকেরা রোগ পূর্বাহ্নে আটকাতে না পেরে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটলে তবে চিকিৎসায় এগোন।'

আমাদের স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ের এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল। রোগের বহিঃ-প্রকাশের আগেই তিনি তা ধরতে পারতেন। এই হল তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি। এই দিব্যদৃষ্টি আছে বলেই দেবতাদের ত্রিনয়ন। ত্রিনয়নের অবস্থান পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডের উপর। সূক্ষ্মদৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। দেখা গেছে মানুষের ক্ষেত্রে এই পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড তেমন কার্যকর নয় বলে মানুষ অনেকগুলি সূক্ষ্ম অনুভূতি—যেমন, দূর-শ্রবণ, দূরদর্শন প্রভৃতি হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পশুজগতে এই পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড কার্যকর থাকার জন্য কুকুর প্রভৃতির দূরশ্রবণ ও দূরদর্শন আছে। পশুরা অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পায়। যাঁরা

যোগ করেন তারা স্পষ্ট জানেন যে, একটি বিশেষ সময়ে বায়ু পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। এর পরই মানুষের ক্ষেত্রে পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড তার হৃত ক্ষমতা ফিরে পেতে থাকে। মানুষের দ্রুত শ্রবণ ও দূর-দৃষ্টি হতে আরম্ভ করে। তার অনুভব শক্তিও বেড়ে যায়। বাস্তব অর্থে নয়, অধ্যাত্ম অর্থেই তার কিছু দূরদৃষ্টি হয়। চোখ বুজলেই যোগী নানা জিনিস দেখতে পান। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার ছবি যেন আগেই তাঁর নজরে পড়ে। সেই দেখেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন অর্থাৎ prophesy. এই ধরনের ব্যক্তিদেরই বলা হয় prophets.

আকুপাংচার তত্ত্ব অনুসারে দেহের যে কোন আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গ মৌলশক্তি-প্রবাহ-পথ ধরে চর্মের উপরিভাগে দেহের অবস্থা কি—তা জানিয়ে দেয়। দিব্যদ্রষ্টারা এ দেখেই বলতে পারেন যে, দু'বছরের মধ্যে তোমার অমুক রোগ হবে ইত্যাদি। দেহের চতুর্দিকে যে বর্ণবলয় তা দেখেই আসন্ন রোগের চরিত্র নির্ণয় করা যায়। বহুক্ষেত্রেই আমি মানুষের রোগের কথা পূর্বাহ্নে বলে দিয়েছি। তবে নিজের যে বড় রোগ হবে একথা বলতে পারিনি কেন? বলেছি, জানতুম, রোগ আরোগ্যের চেষ্টাও কম করিনি। রোগ নিরাময় হয়নি। হয়তো অন্তরতম মানস-সত্তার ইচ্ছা ভিন্ন রকম। তার ইচ্ছার স্বরূপ আজও বুঝতে পারছি না।

আকুপাংচার বিশারদেরা বিশ্বাস করেন যে, দেহের মৌলশক্তি মহা বিশ্বের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। মৌল-শক্তির ভূমিকার উপরই ব্যক্তিদেহের বাইরের অবস্থা নির্ভর করে। মৌল-শক্তির বহিঃপ্রকাশ অনুসারে দেহ যেন পিরামিডের মত কাজ করে। মহাবিশ্বশক্তিকে সে ধরতে পারে।

দেহটা যে একটা নিরেট বস্তুখণ্ড তা নয়। এর দেহশৈলীই এমন যে, মহাবিশ্ব-তরঙ্গ ধরতে পারে। যার দেহের যেমন গঠন, তার মহাবিশ্ব-তরঙ্গ ধরার ক্ষমতাও তেমনই। পিরামিড যে মহাবিশ্ব-তরঙ্গ ধরতে পারে চেক বৈজ্ঞানিকেরা তা প্রমাণ সহকারে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে যদি কেউ ভাল করে জানতে চান তাহলে Sheila Ostrander ও

Lynn Shchroeder-এর চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain-এর ৩৬৬-৭৬, ও ৩৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা পড়ে দেখতে পারেন।

ভারতীয় তন্ত্র মতে দেহ হল মন্দির। দেহচর্চা করেই বোধহয় তাঁরা মন্দিরের চর্চা করেছিলেন। মানুষের দেহের অভ্যন্তরের যে ক্ষুদ্র দেশ (space) তাই মন্দিরে হয়েছে গর্ভগৃহ। নিখিলবৈশ্বিক স্তম্ভ হয়েছে বৈদিক বেদী। নিখিলবৈশ্বিক নর হয়েছেন মন্দিরের অভ্যন্তরের নারায়ণ। নারা অর্থাৎ জলে অর্থাৎ দেশে যার অয়ন অর্থাৎ 'গৃহ' তিনিই নারায়ণ। বাইরে তিনি সীমাহীন নিখিল বিশ্বের আদিমানব, ভেতরে রূপের প্রতীকে নারায়ণ।

আসলে প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মন্দিরগুলো তৈরি হয়েছিল নিখিল বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। হিন্দু মন্দিরের অভ্যন্তরে এই যে গর্ভগৃহ তার প্রতীকি অর্থ হল—আদি বিশৃঙ্খলা, ব্ল্যাক হোলের অভ্যন্তরে যে ধরনের বিশৃঙ্খলা রয়েছে, তাই। এইই হল অপরিচ্ছিন্ন সার্বিকতা যা থেকে মহাবিশ্বের উদয় হয়েছে। মন্দিরে ঢুকতে গেলে এইজন্যই সময়লাঞ্ছিত বহির্দেশ থেকে অভ্যন্তরের অন্ধকারের মধ্যে যেতে হয়। বেদী পরিক্রমা হল সময় থেকে সময়ান্তরালে চলে যাওয়া। আবার সময়ের মধ্যে দিয়ে আসা।

এই যে অভ্যন্তরের অপরিচ্ছিন্ন সার্বিকতা, তা বোধের অতীত হলেও একেবারে যে সব কিছু শূন্য তা নয়।

এইজন্যই প্রাচীন চৈনিক বক্তব্যে বলা হয়েছে :

> "শূন্যতা মানেই অন্ধকার অতল গহ্বর নয়,
> বরং দেশেরই মত বিরাট ও বিস্তৃত।
> এই শূন্যতা হল শান্ত, চমকপ্রদ, নির্ভেজাল ও সর্বগ্রাহী।
> সর্বোপরি এই শূন্যতা রয়েছে আলোদীপ্ত হয়ে।
> এ বিশেষ কিছু নয়,
> কারণ শূন্যতা হল মহামানস, এবং মহামানসই শূন্যতা।"

চিন্তা হলেই রূপ হয়। রূপ যখন চিন্তার প্রতিবিম্ব, সুতরাং রূপও মূলত শূন্যতা। তাই সংস্কৃতে বলা হয়েছে—"রূপম এব শূন্যতা, শূন্যতা এব রূপম।" মধ্যপ্রাচ্যে যে জিগ্‌গুরাটের (Ziggurat) কল্পনা করা হয়েছিল তা থেকেই বোধহয় ঐ অঞ্চলে কালক্রমে মিনার ও গম্বুজাকৃতি উপাসনালয়শীর্ষ আত্মপ্রকাশ করেছে। স্তরে স্তরে স্থূল জগৎ থেকে জিগ্‌গুরাটশীর্ষ উঠে গেছে অসীমের দিকে অনন্তের ইঙ্গিত দিয়ে। ঐ জিগ্‌গুরাটই আমাদের দেশে জগন্নাথের রথ। জিগ্‌গুরাট মানবীয় জগতের সঙ্গে দৈবী জগৎ ও দৈবী জগতের সঙ্গে ঐশ্বরিক জগতের যোগাযোগের ইঙ্গিত বহন করে।

ভারতীয় মন্দিরে যে বেষ্টিত দেশ 'অন্তরীক্ষ' নামে পরিচিত তা এই বোঝাবার জন্য যে, দেশ শূন্যতা নয়। দেশ হল সূক্ষ্ম বস্তুসাত্তিক বিস্তার। দেশ হল সৃষ্টির প্রারম্ভে মহাশূন্যতার ঘনাবস্থা। এই হল আকাশ, ভারতীয় পঞ্চতত্ত্বের শেষ তত্ত্ব—ক্ষিতি, অব্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (দেশ, space)। পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্যায় মহাবিশ্ব (Macro-cosmos) ও ক্ষুদ্র বিশ্বের যে (Micro-cosmos) সমান্তরাল চিন্তা করা হয়েছে ভারতীয় মন্দির শিল্প বহুদিন আগেই সে কথাটা আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছে। মন্দির নির্মাণের জন্য দেশকালের নিখিলত্ব যে একান্ত প্রয়োজন—time-space-continuuam, তা ভারতীয় মন্দিরশিল্পের গঠনশৈলী ও পরিমাপের মধ্যেই স্পষ্ট।

ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে গুহার চিন্তা তো রীতিমত অবাক করে দেবার মত। গুহা হল Blackhole-এর মত। একে বলা হয় উজ্জ্বলনের গর্ভ। এতে রয়েছে নির্জন গোপন শূন্যতা—যার মধ্যে রয়েছে রহস্যময় সৃজনীশক্তি, সময়হীন সময়। ছান্দোগ্য উপনিষদে এইজন্যই হৃদয়ের গভীরতম অন্তঃপুরকে বলা হয়েছে 'হৃদয়ের গুহা'।

ঐ যে বৌদ্ধ স্তূপ কল্পনা—এতে যূপ এবং পুরুষের কল্পনাকে স্তূপের আকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্তূপ হল তথাগতের যথার্থ দেহ, সে-দেহ স্থূল দেহ নয়—ধর্মকায়া। তুরস্ক ও মধ্য প্রাচ্যে গম্বুজাকৃতি যে উপাসনালয়-

চূড়া তা বঙ্কিম দেশের (curved space)-ই দ্যোতক। এবং এ ধারণা তাদের মধ্যে বেশ ব্যক্ত ভাবেই ছিল। এইজন্য এমন ধরনের প্রবাদ ছিল:—'স্তেপের বুকে তাঁবুর মত হয়ে আছে আকাশ'। খুঁজে পেতে দেখলে মসজিদ ও পিরামিডের মধ্যেও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মসজিদের মূল লক্ষ্য নিখিল বিশ্বের প্রাণসত্তা আহরণ করা। তার কুত্‌বি মিনার একথাই বোঝাতে চায় যে, মসজিদের বক্তব্য হল এক ধরনের অতীন্দ্রিয় শূন্যতা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মহাবিশ্বশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যই হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান সবাই নিজস্ব ধারণামত উপাসনালয় তৈরির ক্ষেত্রে দেশের কল্পনা করেছেন। প্রাচীন গ্রীসেও মন্দিরশৈলে এই দেশ-কল্পনা আছে। তবে তা মূলত রূপের বন্ধনে ধৃত বহির্দেশ। কিন্তু ভারতীয় মন্দিরশিল্প—এই দেশকে ব্রহ্মান (pulsating void) ও মহাশূন্যতা (supervoid) এই দুয়ের সঙ্গেই যুক্ত করেছে। মন্দির শীর্ষের সূচ্যগ্র দণ্ড মহাশূন্যতার দিশারী। দণ্ডের মধ্যদেশস্থ নক্ষত্র বিস্ফোরিত বিন্দুরূপা আলো। মন্দিরের পিরামিডাকৃতি ঊর্ধ্বশীর—আকাশরূপ দেশ। মন্দির-গাত্র সূক্ষ্ম থেকে স্থূল জগতের দিকে অনন্তের অবতারণার ইতিহাস।' এই দর্শনের চূড়ান্ত সিদ্ধি ঘটেছে ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের মন্দির স্থাপত্যে। গ্রীক স্থাপত্যের অনাবৃত দৈশিক (spatial) বিস্তার ও উজ্জ্বল আলো থেকে গথিক গীর্জা-শিল্প অনেকটা দূরে থাকলেও এর সঙ্গে এক ফল্গু প্রবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। এখানেও আলোই হল প্রথম শর্ত। এই আলোই হল ঐশ্বরিক শক্তি যা ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির মধ্যেও বাস করে। এখানেও অন্ধকার থেকে আলোর পথে অভিযাত্রার ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট। অপরপক্ষে ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যে পদ্ম তো নিউট্রন ফিল্ড হিসেবে—Micro ও Macro উভয় Cosmos-এর ইঙ্গিতবহ। কোথাও কোথাও মন্দির স্থাপত্যে, যেমন—সিংহলে, বৃক্ষত্ব ফুটে উঠেছে। এই বৃক্ষ মহা-বৈশ্বিক বৃক্ষ, macro-cosmic tree. এই দৈশিক কল্পনা ইহুদীদের মন্দির নির্মাণের মধ্যেও রয়েছে। এইজন্য ইহুদীধর্মে দেশকে মকোম ও

মেওনাহ্‌ নামে উচ্চারণ করে ঈশ্বরের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ইহুদী ধর্মে ঈশ্বরের আর এক নাম মকোম।[১]

কথায় কথায় অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। পূর্বাহ্ণ ধারণা সম্পর্কে যা বলতে যাচ্ছিলাম তাই আবার বলা যাক। এই যে পূর্বাহ্ণ জ্ঞান, নিকট প্রাচ্যের বহুদেশেও বহুজনে তার প্রমাণ দিয়েছেন—এমনকি কম্যুনিস্ট রাজত্ব কালেই। বাস্তবক্ষেত্রে এর বহু প্রমাণ পাওয়া গেলেও এর গোপন রহস্য তেমন ভাবে ধরা যায়নি। ভবিষ্যৎবাণীর গোপন সূত্র ধরার চেষ্টায় অনেকেই মনে করেন যে, এখানে সময়ের বিরাট একটা ভূমিকা রয়েছে। সময় যেন conveyor belt-এর মত দৃশ্যসমূহ আমাদের কাছে নিয়ে আসে। দৃশ্য বা ছবি ছিলই, চক্রাবর্তে তা চোখের সামনে এসে হাজির হয়। দিব্যদ্রষ্টারা যেন পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে এমন অনেক কিছু দেখতে পান যা সমতল প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই না। আসলে একেই বলে মাত্রা। পাহাড়ের চূড়া হল বহুমাত্রিক অবস্থান। যেখানে গেলে জগতের বিরাট প্রান্তর একবারে চোখের উপর খুলে যায়। যেমন, পাহাড়ের বাঁক থেকে-থেকে যে ট্রেনটা আসছে, সমতল প্রান্তরে পাহাড়ের আড়ালে থাকা মানুষ সে কথা বলতে না পারলেও পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ তা পারে। Precognition এই ধরনের ব্যাপার।

অধ্যাত্মবাদী নয়, এমন বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে রয়েছে এমন একটি বীজ, বা এমন এক গঠনশৈলী যা ভবিষ্যৎকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে—যেমন ওক্‌ বৃক্ষের বীজ পরিবেশ থেকে সেইসব কিছুই সংগ্রহ করে নিয়ে আসে যা তাকে ওক বৃক্ষরূপে ফুটে উঠতে সাহায্য করে।

১. মন্দির নির্মাণ শৈলে—এই দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে কপিলা বাৎসায়ন সংকলিত Concepts of Space—Ancient and Modern পড়ে দেখতে পারেন।

পূর্বাহ্ন দর্শন-এর গোপন কথা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়ই জানা যাবে—কম্যুনিস্ট দেশের বৈজ্ঞানিকেরা তেমনই মনে করেন। বুলগেরিয়ান বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত এর কিনারা করার জন্য যোগ করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন।[১]

যোগের মধ্যে যে এর উত্তর আছে এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। অধ্যাত্মবাদীরা ভারতবর্ষে যাকে জ্যোতি বলেন, বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় তারই নাম বায়ো-প্লাজমা। মহাশূন্যতার বুক জুড়ে নানা ভাবে ঘন, হাল্কা ইত্যাদি ভাবে এই বায়ো-প্লাজমা রয়েছে। এই প্লাজমা সচেতন। এই প্লাজমাই মানুষকে অতীত ভবিষ্যৎ সব কিছু সম্পর্কে নির্দেশ দেয়। এই প্লাজমা যে পরমাণু দিয়ে গঠিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং এই পরমাণুগুলিও যে সচেতন তা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্যার জেমস্ জিনস্-এর মত বৈজ্ঞানিকও স্বীকার করেছেন। জেমস্ জিনস্ সৃষ্টির পেছনে এক সর্বগত মনের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'জড়ের রাজ্যে মনের আবির্ভাবকে এখন আর আকস্মিক ও অনধিকার প্রবেশ বলে মনেই হয় না। বরং তাকে জড় রাজ্যের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসাবে আমাদের স্বাগত অভিনন্দন জানানো কর্তব্য।' স্বীকার করেছেন তাঁর 'দি মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স' গ্রন্থে। পাঠক প্রমথনাথ সেনগুপ্ত অনূদিত এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পড়ে দেখতে পারেন। তবে সাম্যবাদী দেশের বৈজ্ঞানিকেরা সকল কিছুর মধ্যেই এখনও কার্যকারণের সম্পর্কের কথা ছেড়ে দিতে রাজি নন। বুলগেরিয়ান বৈজ্ঞানিকেরা পূর্বাহ্ন দর্শকের দেহের চতুর্দিকস্থ বায়োলজিক্যাল ফিল্ড চর্চা করে দেখছেন যে. দিব্যদৃষ্টি ও প্রাক্দর্শনের রহস্য-সমাধানের কোন সূত্র সেখানে পাওয়া যায় কিনা। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাদের মস্তিষ্কস্নায়ু ভিন্ন ভাবে কাজ করে কিনা সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

চেক বিজ্ঞানী ডঃ মিলান রিজ্‌ল (Dr. Milan Ryzl) পূর্বাহ্ন-

---

১. Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain—Sheila Ostrander and Leynn Schroeder p. 280.

দর্শন সম্পর্কে মনে করেন যে, আত্মশক্তি (psi)-র রহস্য পূর্বাহ্ণ-দর্শনের চাবি দিয়েই উদ্‌ঘাটিত করা যেতে পারে। আত্মশক্তি ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভ দিয়ে তৈরি ডঃ রিজ্‌ল এমন তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। কারণ, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভ প্রাক্‌দর্শনের উপর কোন সূত্র আমাদের দিতে পারে নি! রুশ বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে আত্মশক্তিক্ষেত্রে বা psi-field-এর কথা বলেন। কিন্তু এই psi-field কি? ভবিষ্যৎ দর্শন বা প্রাক্‌দর্শনের ব্যাখ্যা psi-field কি ভাবে করতে পারে? ডঃ রিজ্‌লের মতে, এ বুঝতে গেলে দেশ ও কাল সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন। দেশকালের ব্যাপারটা খুবই গভীর। অধিমনোবিজ্ঞানীরা যা কাজ করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ রিজ্‌ল-এর ধারণা, বাস্তব জীবনের উপরে একটা উচ্চমাত্রার সত্য আছে। সেই সত্যকে না জানা পর্যন্ত এসব কিছু যথার্থ ভাবে বোঝা যাবে না। ডঃ রিজলের মতে যে জগৎ সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে তা বৃহত্তর কোন অপরিচ্ছিন্নের অংশ মাত্র। আমাদের এই ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বেও অন্য ধরনের সত্য আছে। সেই সত্যকে বোঝাতে হলে ভাষার মধ্যেও একটা রূপান্তর আনার প্রয়োজন আছে। সেই অদ্ভুত এক অধরা সত্যকে ধরার চেষ্টাতেই আধুনিক কবিরা প্রচলিত বাক্‌রীতি ভঙ্গ করার চেষ্টা করছেন। হপ্‌কিনস নতুন শব্দ আমদানী করেছেন। জেমস জয়েসও ইউলেসিস উপন্যাসে আমদানী করেছেন নতুন শব্দ।

ডঃ রিজ্‌ল-এর মতে আধুনিক সভ্যতাতে মানুষ ক্রমশঃ তার আত্মচর্চা থেকে দূর সরে যাচ্ছে। জোর দেওয়া হচ্ছে বস্তুমাত্রিক যান্ত্রিক জীবনের উপর। অধিমনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিকে মহাবিশ্ব রহস্যের ভিন্ন দিকে তাকাতে সাহায্য করতে পারে, ব্যক্তিত্বের যথার্থ উপাদান সম্পর্কেও আমাদের হদিশ দিতে পারে।

উল্‌ফ মেসিং-এর মত রুশ আত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রাক্‌দর্শন বা ভাবি দর্শন সম্পর্কে বলেছেন যে, ভবিষ্যৎ 'অতীত ও বর্তমান' দ্বারাই আকৃতি প্রদত্ত। এই তিন কালের মধ্যে রীতিমত যোগাযোগ পদ্ধতি

রয়েছে। সাধারণ মানুষ এই যোগাযোগের সূত্র সম্পর্কে অবহিত নয় এই যা।

আসলে ব্যাপারটা হল এই যে, একটি দীর্ঘ রেখার নির্দিষ্ট প্রান্তে ঘটনা ঘটেই আছে। অকস্মাৎ তা ভবিষ্যৎ বক্তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠে। এর গোপন রহস্য মেসিং মনে করেন অল্প দিনের মধ্যেই মানুষ জানতে পারবে। এর মধ্যে অবাক করে দেবার মত কিছু নেই। ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের অধিগম্য হয়নি এই যা।

জিমা নামে সোভিয়েত রাশিয়ায় বিখ্যাত এক ডাইনি আছে। তাঁর মতে ভবিষ্যৎ দর্শন তার হয় টি. ভি-র মত কোন স্ক্রীনে। তাঁর মনই এই শূন্য স্ক্রীন। সেখানেই ঘটনার চিত্র ফুটে উঠে। যদিও মুখ্যত সে স্বচ্ছ পাথর বা স্বচ্ছ জলের মধ্যেই এই ভবিষ্যতের প্রতিবিম্ব দেখে, যেমন নাস্ত্রাদামু দেখতেন কটাহের মধ্যে।

জিমার মতে অনেক সময়ই বক্তব্য আসে প্রতীকের মধ্য দিয়ে। যেমন, তাঁর মতে যখনই নোপিলয়নের সময়ের ইউনিফর্ম পরা সেনাবাহিনী তিনি দেখতে পান তখনই ধরে নেন যে, কোন ধ্বংস জাতীয় কিছু ঘটছে যাতে হাজার হাজার লোক মারা যাবে।

মানুষের মধ্যে দূরদৃষ্টির ক্ষমতা অনেক সময়ই উন্মাদনৃত্যের মধ্য দিয়ে আসে. গোঁদা বাংলায় যাকে বলে বায়াল। মধ্য এশিয়ার শমনেরা, আফ্রিকার আদিবাসীরা, এমন কি ভারতের ভরে পাওয়া বায়ালীরা বিশেষ দৃষ্টির অধিকারী বলেই অনেকে মনে করেন। যেমন ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের মিনাডেরা। নৃত্যের সঙ্গে এই ধরনের অলৌকিক ক্ষমতার সম্পর্ক কি, অনেকের কাছে তা একটি ধাঁধার মত। তবে বর্তমান গ্রন্থের লেখক বহু অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই নৃত্য আপাত-দৃষ্টিতে উন্মাদ নৃত্য হিসাবে প্রতিভাত হলেও মূলত নিখিলবিশ্ব-নৃত্যের সঙ্গে এর যোগ আছে। নিখিলবিশ্বের ছন্দের সঙ্গে যোগাযোগ হলে দর্শন ক্ষমতার নতুন মাত্রা খুলে যায়। মানুষ ত্রিমাত্রিক অবস্থার উর্ধ্ব-মাত্রা লাভ করে। তখনই তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়।

নৃত্য এক ধরনের চরম আনন্দ দেয়, ইংরেজীতে যাকে বলে ecstasy. Ecstasy-র যথার্থ অর্থ বাইরে দাঁড়িয়ে দেখা। নৃত্যের মাধ্যমে অদ্ভুত রকম উন্মাদ আনন্দ হলে যোগীদের সূক্ষ্ম দেহের মত আত্মা স্থূলদেহের বাইরে চলে যায়। কালই (time) এসে যায় তার নিয়ন্ত্রণে। ফলে ইচ্ছা মাত্র তার আত্মা অতীত ও ভবিষ্যতেও যাতায়াত করতে পারে যখন তখন।

ভাবি দর্শনের সবটাই যে বিজ্ঞানসম্মত তা নয়। এর মধ্যে অনেকটা আত্মিক ব্যাপারও আছে। ফ্রয়েড-এর মত বাস্তব মানসিকতাসম্পন্ন মনোস্তত্ত্ববিদও আত্মিক এই দিকটিকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁর ভয় ছিল যদি আত্মিক শক্তির এই দরজা খুলে যায়, তাহলে বিশ্ব ডাইনীবিদ্যার বন্যায় ভেসে যাবে।

কিন্তু সার্বিক দৃষ্টির ক্ষেত্রে আত্মিক এই অবস্থাকে অস্বীকার করা কি সহজ হবে? হবে না। সেইজন্যই চেকোশ্লোভাকরা দিব্যদৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি psi-field-এর কল্পনা করেছেন। ইংল্যাণ্ডে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে Parapsychological Association-এর যে ৭ম বাৎসরিক অধিবেশন বসে তাতে বিজ্ঞানী Dr. W. G. Roll মন্তব্য করেছিলেন যে, electromagnetic বা gravitational field-এর মত psi-field জাতীয় একটা কিছু আছেই। প্রাণময় বস্তু ও জড়বস্তু সব কিছুরই এই psi-field রয়েছেই। পদার্থিক যে কোন ফিল্ডের সঙ্গেই এর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার খেলা চলে। মানুষের যে অতীন্দ্রিয় শক্তি Dr. G. D. Wasserman-এর মত বিজ্ঞানীর মতে তা এই psi-field-এর জন্যই সম্ভব হয়। এই যে psi-field, তা অতি সূক্ষ্ম। পদার্থিক যে কোন field-ই অতি সহজেই একে গ্রহণ করতে পারে। আত্মাই হল সকল ধরনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার উৎস।

এই যে দিব্যদর্শনের ক্ষমতা, এই যে ভাবি দর্শনের ক্ষমতা, প্রাক্-কথনের ক্ষমতা—তা প্রাচীন কালের প্রায় সব মানুষের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ঋষি পুরুষদের কথা আলাদা, তাঁরা চোখ বুজলেই

সব দেখতে পেতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ দেখতেন কতকগুলি বিশেষ ধারার মধ্য দিয়ে। এই দর্শকদের বলা হত Diviner. এরা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তার সম্পর্কে কিছু না জেনেই অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে দিতেন। শুধু কতকগুলি মাধ্যমের সাহায্য নিতেন। যেমন, পশুর অন্ত্র, যে-কোন জিনিস, স্ফটিক-গোলক, জন্ম সময় ইত্যাদি।

ঘটনাগুলোর বক্তব্য দাঁড়ায় এই রকম: যেন কোন মহাকাশযান উপরে উঠছে। এর উৎক্ষপণের মুহূর্ত থেকে মিশন কনট্রোলএর নাড়ি-নক্ষত্র সব জেনে নেয়। কোথা দিয়ে যাবে, কেমন করে যাবে, কোথায় গিয়ে বিচ্ছিন্ন হবে, সবই ছক কষা। ভেতরের মহাকাশচারীর কিছুই করার নেই। পৃথিবীতে যে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আছেন, যে ভাবে চলছে তাঁরাই সব চালাবেন। তবে কখনও যদি বিরক্তিকর ক্লান্তিতে উত্যক্ত হয়ে মহাকাশচারী হঠাৎ এমন কোন বোতাম টিপে দিয়ে বসে, যা তার টেপার কথা নয়, তখন ? সমস্ত পরিকল্পনাটাই তখন ভেস্তে যেতে পারে। তবে পৃথিবীর মিশন কন্ট্রোলের দৃষ্টি মহাকাশচারী এড়াতে পারবেন না। মিশন কন্ট্রোল থেকে বিজ্ঞানীরা তাকে বলে দেবেন যে, তার পরিকল্পনা-হীন কাজের পরিণতি কি হবে। তবে মিশন কন্ট্রোলের এই নিয়ন্ত্রণ বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। মহাকাশচারী তাদের নির্দেশ না মানলে মহাকাশযানটি চিরকালের জন্য মহাদেশের বুকে হারিয়ে যাবে।

আসলে Divination-ও এইভাবেই কাজ করে। এই গণৎকারেরা তাঁদের বিদ্যে অনুযায়ী মানুষকে নির্দেশ দিতে পারেন। তার বিশেষ বিশেষ কাজের পরিণতি কি হবে বলতে পারেন। এটা এড়াতে হলে কি করতে হবে তাও বলতে পারেন। কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারেন না যে, ভবিষ্যতে এটা ঘটবেই। কারণ যেখানে প্রশ্নকর্তার অন্তর-তমের বিশেষ একটা মর্জি কাজ করে—মিশন কন্ট্রোলের মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণ করার মত। একে নিয়ন্ত্রণ নাও করা যেতে পারে।

লোকে এইসব গণৎকারদের কাছে যেভাবে জানতে চায়, সেই ভাবে জবাব পায়। প্রায় সব জায়গাতেই গণৎকারদের কাছে জানবার

ধরণ এই প্রকার ঃ

(১) আমি কি আজকের লটারী পাব ?

(২) একে বিয়ে করা কি উচিত হবে ?

(৩) আমার ভবিষ্যৎ কি রকম হবে ?

প্রশ্ন যত স্পষ্ট, জবাবও তেমনই স্পষ্ট। যে সকল প্রশ্নে সব কিছুই জানবার চেষ্টা হয় সেই সকল প্রশ্নের জবাবও তেমনি ভাবে একই সঙ্গে নানা অর্থদ্যোতক।

গণৎকারেরা অনেক সময় জবাব দেবার জন্য কিছু কিছু জিনিস ব্যবহার করেন। যেমন প্রশ্নকর্তার প্রিয় জিনিস কি জানতে চান। গণৎকারের নিজস্ব কোন জিনিস স্পর্শ করতে বলেন। হয়তো মেঝেতে কোন ঘুঁটি ছুঁড়ে দিয়ে জবাব জানতে চান। ঘুঁটির সংখ্যার উপর জবাবের নঙর্থকতা বা ধ্বনাত্মকতা নির্ভর করে—যেমন কুরুসভায় শকুনির পাশার দান। অনেক সময় এরা কোন স্বচ্ছ জিনিসের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন, যেমন স্ফটিক-পাথর বা জল। সময় গণৎকারেরা মনকে এমন নিমগ্ন করেন যে, তা বিশেষ কোন কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূ হতে হতে গণৎকারকে ভর জাতীয় আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে ঠেলে দেয়। সেই মুহূর্তে মন বহুমাত্রিক একটা অবস্থা লাভ করে। সময়ের উপর তার নিয়ন্ত্রণও এসে যায়।

আদিকালে নানা ধরনের ভবিষ্যৎবাণী করার পদ্ধতি ছিল—যেমন ধূলোর চরিত্র দেখে বলা, পশুদের ব্যবহার লক্ষ্য করে ভবিষ্যৎ বলা প্রভৃতি। তবে ভবিষ্যৎ বলার জন্য পাঁচটি পদ্ধতিই বিশেষভাবে স্বীকৃত। যেমন, জ্যোতিষবিদ্যা, তাস জাতীয় কার্ড ফেলে গণনা করা, করতল দেখে বলা, ভূমিতে রেখা এঁকে গণনা করা, চৈনিক ষড়্‌রেখীয় ও ত্রিরেখীয় চিত্র এঁকে বলা ইত্যাদি। ভূমিতে রেখা এঁকে বলার যে কলা-কৌশল তার উদ্ভব ইরানে। কিন্তু এক সময়ে তা সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। নিকট প্রাচ্য ও আফ্রিকাতে এর প্রচলন ছিল যথেষ্ট।

চৈনিক 'পরিবর্তনের গ্রন্থে' এরকমই বিশ্বাস ব্যক্ত করা হয়েছে যে,

অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ একটি কাহিনীময় গ্রন্থের মত। যেখানটায় পড়া হচ্ছে তা বর্তমান। যা পড়া হয়ে গেছে তা অতীত, যা পড়া হয়নি তা ভবিষ্যৎ। সময় হল এই গ্রন্থের মত, যে পড়া শেষ করেছে তার পক্ষে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই সমান।

ঘুঁটি যাঁরা ফেলেন তাঁরা ঘুঁটির গাত্রে নিজেদের অভীষ্ট সংখ্যা ওঠাবার জন্য আত্মশক্তি ব্যবহার করেন। এই আত্মশক্তি বাইরে এসে যখন কোন কিছুকে প্রভাবিত করে তখন তাকে বলে pskcho-kineses বা pk. এই pk প্রয়োগ করে বাইরের জিনিসকে বাঁকিয়ে দেওয়া, পেছনে ঠেলে দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রমাণ আত্মশক্তিধর ব্যক্তিরা বর্তমানে দিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় বসেই তাঁরা এই pk-এর প্রমাণ দিচ্ছেন। সম্ভবত মহাভারতের শকুনি এই pk-এর অধিকারী ছিলেন। এই pk দিয়েই তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় হারিয়ে দেন।

হস্তরেখাবিদদের ধারণা, হাতের রেখায় যেমন রয়েছে করতলের অধিকারীর মানসতরঙ্গের প্রতিফলন, তেমনই রয়েছে মহাকাশের চিত্রও। অপরপক্ষে জ্যোতির্বিদ্যার মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব। এই প্রভাব মানবজীবনের গতিবিধি ও চরিত্রও নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে চেকোশ্লোভাকিয়া ও রাশিয়া যে চমকপদ উন্নতি করেছে পাঠক যদি তা জানতে চান তাহলে পাঠক—Shila Ostrander Lynn Schroeder-এর Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain নামে বিখ্যাত গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। গ্রন্থটিতে যে গুলগল্পের বর্ণনা রয়েছে তা নয়। সবার অলক্ষ্যে সমাজতন্ত্রী দেশগুলি আত্মবিজ্ঞান চর্চায় যে বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ নিয়ে চমকপ্রদ প্রমাণ পেয়েছিল রয়েছে তার সাক্ষ্য।

আমার মূল বক্তব্যে ফিরে আসা যাক—যোগে নানা ধরনের দর্শন, যার মধ্যে প্রাক্‌দর্শন বা পূর্বাহ্ন-দর্শনের ব্যাপারটাও রয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা এর উপর নানা ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেও চূড়ান্ত জবাব যে পেয়েছেন, তা নয়। কিন্তু আমার নিজের কাছে মনে হয়েছে যে, এর

চূড়ান্ত জবাব রয়েছে ঈশ্বরের চিৎসত্তার মধ্যে। চিৎসত্তার তিনটি স্তর— অচেতন চিৎসত্তা, সূক্ষ্ম চিৎসত্তা ও গতিময় চিৎসত্তা। অচেতন চিৎসত্তার অবস্থা মানুষের নিবিড় নিদ্রার মত,—সেখানে মানস ক্রিয়া আছে কি নেই তা বুঝবারই ক্ষমতা নেই। সূক্ষ্ম চিৎসত্তা অবচেতন মানসের মত। ঘুমেরই মধ্যে স্বপ্নের চিৎসত্তার মত। তার ব্যাপ্তি জাগ্রত চিৎসত্তা থেকে অনেক ব্যাপ্ত। অনেক সময়ই এই চিৎসত্তাজাত স্বপ্ন অতীত ও ভবিষ্যতের কথাও বলে দেয়। জাগ্রত চেতনা বাস্তব জগতের মানসের মত। য়ুঙের মতে অচেতন চেতনা সাগরের বুকে ব্যাপ্ত পাষাণ স্তরের মত। অবচেতন চেতনা আকাশের দিকে শির তোলা জলের নিচের পাহাড়। জাগ্রত চেতনা জলের উপর জেগে ওঠা অসংখ্য পাহাড়ের চূড়ার মত। যাকে আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মনে হয় তা আসলে সমুদ্রের তলদেশে সুপ্ত পাষাণের অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তির মত। এই অচেতন চেতনায় পৌঁছুলে দেখা যায় যে জাগ্রত চেতনার বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের চূড়াগুলি মূলত সবই একই পাষাণজাত। কেউ যথার্থ রূপে বিচ্ছিন্ন নয়। বিচ্ছিন্ন অথচ জলের নিচের পাহাড়গুলি যদি একে অপরকে দেখে, স্বপ্নের ছবির মত দেখবে। চূড়া থেকে তার ব্যাপ্তি অনেক বেশি। হয়তো যার চূড়া পরস্পর বেশ দূরত্ব রেখে বিচ্ছিন্ন, জলের নিচে তা অনেক কাছে, পরস্পর স্পর্শযোগ্য দূরত্বের মধ্যে। উপর থেকে পাহাড়ের চূড়াগুলি নিজেদের যতটা বিচ্ছিন্ন করে দেখে জলের নিচ থেকে ততটা বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। জলের কম্পনে এ সবই আবার কেমন খেয়ালী ধরনের দেখায়—তার ঘনত্বকে হাল্কা-ধরনের দেখায় স্বপ্নে দেখা ছবিরই মত। ঈশ্বর স্বয়ং অপরিচ্ছন্ন অচেতন চিৎসত্তা, স্বপ্ন অবচেতন চিত্তসত্তা, জাগরণ বাস্তব চিৎসত্তা। জগৎ রহস্যের ক্ষেত্রে অচেতন স্তর মহাশূন্যতার স্তর। স্বপ্নের স্তর হাল্কা স্বচ্ছ ধূম্রস্তর। চেতন স্তর আলোর স্তর। এই আলোর স্তরই একমাত্রার superstring—যার তরঙ্গে তরঙ্গে জগতের নানা বিচিত্র অভিব্যক্তি। কিন্তু যেহেতু আলোর ঘনীভূত বাস্তব উপাদান দিয়ে জগৎ সৃষ্ট সেইজন্য তার কোথাও চেতনার অভাব নেই। ইদানিং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জড় বলে

কিছু নেই। যা জড় বলে প্রতীয়মান তা আবদ্ধ চিৎশক্তি। যা অচল অথচ প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত, যেমন উদ্ভিদ, তা অবচেতন মনেরই মত অনেক বেশি চেতনায় ব্যাপ্ত। আধুনিক বিজ্ঞান যে তা প্রমাণ করেছে একথা যদি জানতে হয় তবে Peter Tomkins ও Christopher Bird লিখিত The Secret Life of Plants পঠিতব্য। জাগ্রত চেতনা হল আমাদের চলমান জীবনের মানস। এই হল গতিময় প্লাজমার জগৎ। এই প্লাজমা স্থিত অবস্থায়, সূক্ষ্ম অবস্থায় (জীবাত্মিক অবস্থায়) ও জাগ্রত অবস্থায় সর্বদাই চেতন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অচেতন বলে কিছু নেই। জীবনের মাত্রা বাড়ানো গেলে প্লাজমার এই সূক্ষ্ম স্তরে যাওয়া যায়। তখন সর্বব্যাপ্ত প্লাজমিক চেতনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সব কিছুরই অন্তরের অনুভূতিকে ধরা যায়। সব কিছুর মধ্যেই যেমন প্রাণের তরঙ্গ আছে তেমনই মানস তরঙ্গও আছে। মূল মানস সত্তার সঙ্গে একত্র হতে পারলে প্রত্যেকেরই অন্তরের কথা বোঝা যায়। মূল মানস সত্তাই হল য়ুঙের collective unconscious.

সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিই কতটা যে মানস ক্রিয়ায় ক্রিয়মান—যাদের অনুভূতিপ্রবণতা প্রবল, তাঁরাই তা বুঝতে পারেন। আমি নিজে হেমন্তের ভাষা বুঝতে পারি, শীতার্ত প্রান্তরের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি। সম্ভবত প্রকৃতির প্লাজমিক অবস্থা এই সময় ঘনীভূত হয়। অদৃশ্যে সঞ্চরমান ইতিহাস এই সময় কর্ণগোচর হয়ে ওঠে। পৃথিবীর কত অতীত বর্তমানে ঢেউ তুলে কানাকানি করে চলে যায়।

কেউ কেউ এই সহজাত অনুভবশক্তি নিয়েই জন্মান। আমাদের স্বর্গত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির এই হৃদয়ের বাণী শুনতে পেতেন। তাঁর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম চেতনা ছিল। সেই চেতনার বলে তিনি সূক্ষ্ম জিনিসও দেখতে পেতেন। আত্মাতে তিনি বিশ্বাস করতেন বলেই 'দেবযান' গ্রন্থ লিখেছিলেন। দেবযানের অভিজ্ঞতা ideo-plastic স্তরের অভিজ্ঞা। পশ্চিমীদের ধারণার সঙ্গে অনেকটা মিলে। সাময়িক মৃত্যুর পর প্রাণস্পন্দনে ফিরে এসে যাঁরা তাদের

অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাঁরা সবাই দেবযানের অনুরূপ কাহিনীই বলেছেন। বর্তমান গ্রন্থের লেখক যূথবদ্ধ আত্মাদের দেশের বহু উর্ধ্বস্তরে ঘুরতে দেখেছেন—অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান ভঙ্গীতে দেখেছেন। কিন্তু দেবযানের ইহলৌকিক চিত্রের মত করে দেখেন নি।

দেশের বুকে গ্রহ-গ্রহান্তরে জীবও আছে। তবে এইসব গ্রহ আমাদের সৌরমণ্ডলে অবস্থিত নয়। এইসব জীবের মধ্যে নিশ্চিতরূপেই কারো মাত্রা আমাদের বাহ্য ত্রিমাত্রা অপেক্ষা অনেক বেশি। তাদের ক্ষমতার বিচ্ছুরণ এত প্রবল যে, ত্রিমাত্রিক জৈব বোধের সাহায্যে তাঁদের বোঝা যাবে না। কোন ত্রিমাত্রিক স্থূল দেহ সেখানে অক্ষত থাকতে পারবে না। জীবের সূক্ষ্মদেহ বহুমাত্রিক। শুধুমাত্র সূক্ষ্মদেহী আত্মাই হয়তো সেখানে যেতে পারে। তাই জীবাত্মার ক্ষেত্রেও—স্থূলদেহেই তাকে বহুমাত্রার জন্য তৈরি করতে হয়।

সূক্ষ্মলোক সম্পর্কে বিভূতিভূষণের অনুভূতি সত্য হোক না হোক, তাঁর আত্মার ব্যাপ্তি যে প্রকৃতিতে অপার বিস্তার লাভ করতে পেরেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'আরণ্যক' গ্রন্থে তিনি প্রকৃতির অন্তরের বাণী শুনতে পেয়েছিলেন। উদ্ভিদের যে কী বিপুল প্রাণের বিস্তার, মানস ব্যাপ্তি, একথা বোধহয় জগৎ Peter Tomkins ও Christopher Bird-এর The Secret Life of Plants বেরুবার আগে তেমন-ভাবে জানতে পারে নি। এখানে রয়েছে বিজ্ঞানের প্রমাণ। কিন্তু বিভূতিভূষণের আরণ্যকের জন্য এবং Hudson-এর Green Valley-এর জন্য বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় নি। অন্তর পেতে দিয়ে তারা বৈজ্ঞানিক সত্যকে অনেক আগেই জানতে পেরেছিলেন। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কতটা এই প্রকৃতির আত্মিক পরিচয় পেয়েছিলেন সেটা পণ্ডিত ব্যক্তিরাই বলতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথ ক্রমবিকাশ তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। জড় পৃথিবীর বুক থেকে প্রাণ ও মনের বিকাশের অপূর্ব বাক্য-ঝঙ্কার তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়, যেমন 'আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে আমারে মিশায়ে লয়ে···' ইত্যাদি।

কিন্তু কোথাও বোধহয় জীবনানন্দের মত এমন একাত্মভাবে প্রকৃতিকে কেউ অনুভব করেন নি। এখানে দর্শনের কোন মানবিকতা নিয়ে কবি কাব্য রচনা করেন নি, কিন্তু কাব্যের মধ্যে অবধারিত দর্শন ফুটে উঠেছে ; যেমন তারাশঙ্করের হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় মহাজীবনের সত্য চূড়ান্ত হয়ে বেড়ে উঠেছে ডগানো লতার মত।

জীবনানন্দের নিচের কয়েকটি কথার মত এমন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা আমার যেন কখনও কোথাও আর চোখে পড়ে নি। যেমন,

'আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভাল,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধ রাতে ডানার সঞ্চার :
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ, অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো !
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা ; অশথের ডালে ডালে ডাকিয়াছে বক,
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এইসব নিভৃত কুহক :

এখানে প্রকৃতির সঙ্গে যে একাত্মতা, তার তুলনা নেই। এতটা অনুভব হয়তো আমার নেই, কিংবা আছে, প্রকাশের ভাষা নেই। আমিও আগত হেমন্ত থেকে শীত পর্যন্ত নিজেকে হারিয়ে ফেলি। এখানে যৌবনের উদ্দামতা নেই বসন্তের মত, গ্রীষ্মের উত্তপ্ত জীবন নেই, বর্ষার সংগ্রাম নেই, আছে শুধুমাত্র সূক্ষ্মবোধের জীবন। স্মরণাতীত কাল থেকে বয়ে আসা অগণিত ইতিহাস যেন সূক্ষ্ম কুয়াশার আস্তরণে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরণীকে এই সময় রহস্যময় করে তোলে।

এই রহস্যময়তা আমার জীবনে সেই শৈশব থেকেই ছিল। সেই নির্জন রহস্যময়তা আমাকে এতটা আচ্ছন্ন করে রাখতো যে হয়তো দিব্য-লোকের ইশারা পেতাম। জানি না এই ভাব বহুজন্মের অর্জিত ভাব কিনা। হয়তো সেই কারণেই হিমালয়ের কোন মহাপুরুষ আমাকে করুণা করে দিব্যজগতে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই দিব্যজগতের এত স্বাদ নেই, যে স্বাদ রয়েছে হেমন্তের সূক্ষ্ম কুয়াশায়, শীতের ধুঁয়ার্ত কুজ্ঝটিকায়। এখানে প্রকৃতি থেকে হারানো প্রাণ কত যে

কানাকানি করে কে বলবে !

বহুদিন জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত ছিলুম। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলুম। ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস নাগাদ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ার পর আমার আগের মত সেই চলবার ক্ষমতাই যেন হারিয়ে গেছে। নিজের চলবার ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি—ঘরের পাশে লেকের ধারে হেঁটে হেঁটে। হাঁটি, অজস্র লোক হাঁটে। কিন্তু আমি যেন আর কাউকেই দেখতে পাই না। সমগ্র প্রকৃতি যেন শ্রাবণের ধারার মত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কত অসংখ্য সূক্ষ্ম-সত্তার সঙ্গে কথা বলি বলতে পারব না। কিন্তু একা আমি থাকি না একথা সত্য। স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে দলে দলে উঠে আসে হারানো পৃথিবী।

যোগে আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃত অঞ্চল দেখেছি। চমকে গেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন অন্তর মথিত করা আনন্দ পেয়েছি তা বলব না। ধীরে ধীরে যোগে দৃশ্য দৃশ্যান্তর হারিয়ে গেছে। প্রাণীকুললাঞ্ছিত গ্রহগ্রহান্তর, দেবদেবী সব। অবিচ্ছিন্ন জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে গেছে মানস নেত্র। তারও উপর লক্ষ্য করেছি দর্পণের মত দীর্ঘ বিস্তার। তারও পরে ক্রমশ ফুটে ওঠা অনালোড়িত বিপুল অন্ধকার। সেখানে মানস সত্তার শেষ গতিটুকুও যেন হারিয়ে গেছে নিবিড় নিদ্রায়। চমক চমকে উঠেছি। মানসক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যাক এ যেন কিছুতেই চাইতে ইচ্ছা করে না। ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে একেই বলা হয়েছে 'মোক্ষ-ভীতি'। রবীন্দ্রনাথ যোগী পুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই মোক্ষ-ভীতির কথা মনে রেখেই বোধহয় লিখেছিলেন :

"কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়
জয় অজানার জয়।"

সেই অজানার জয়ের কথা কিছুতেই আমি ভাবতে পারিনে। কোন মানসসম্পন্ন আত্মাই বোধহয় ভাবতে পারে না। তাই স্থূল দেহ নাশ হলেও সূক্ষ্ম আত্মারা 'ideo-plastic plane' বা মানস সূক্ষ্মজগৎ তৈরি করে তাতে বাস করে। তারপর পরিশুদ্ধ আত্মা আরো উপরে

উঠলে একটা মানসপ্রবাহ থাকে শুধু। এই মানসপ্রবাহকে কিছুতেই হারাতে ইচ্ছে করে না। আমার বাবার লেখা সেই গানের কথা মনে পড়ে ঃ—

"অনন্তেরই কোলে বাসনা হিল্লোলে
অহং বহিয়া যায়।
আমার আদি নাহি যায়
অন্ত বা কোথায়
সকলই আঁধারে ধায়!"

এই মানসক্রিয়া হারিয়ে থাকা মানে নিজের কাছেই একা হয়ে যাওয়া। সেই একাকিত্বের যন্ত্রণার বোধহয় শেষ নেই। সেই জন্য ঈশ্বরের অন্তস্থ ইচ্ছা কামরূপে ফুটে উঠে বিপুল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জগৎ সৃষ্টি করে একাকিত্ব দূর করেছে। এ জগৎ যেন নাট্যকারের রচিত নাটকের চরিত্রে ভরা—যে চরিত্রের কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে। আসলে নাট্যকার নিজেই হাসছেন, নিজেই কাঁদছেন। তাঁর দুঃখেও দুঃখ নেই, আছে আনন্দ। শুধু সুখ হয় না দুঃখ না হলে, তাই দুঃখ। ঈশ্বর দুঃখের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুখ পাবেন বলে। ঐশ্বরিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে লোকে যখন এই দিব্যসৃষ্টিকে বোঝে—বোঝে যে, ঈশ্বরের আনন্দ-লীলায় সে নিজেই নিজেরই লিখিত নাটকের বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ একজন নট মাত্র তখন তার দুঃখসুখে সমবোধ আসে শ্রীমদ্ভগবত গীতার সেই বক্তব্যের মত ঃ—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ—
বীতরাগ ভয়ক্রোধ স্থিতধীর্মুনিরুচ্চতে॥

তখনই শেলীর অন্তর থেকে ফুটে বেরয় ঃ—

'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.'

এই হারিয়ে যাবার ভয় আমার বড় ভয়। তাই স্থূলদেহের শেষে শেষপর্যন্ত কিছু থাকে কি না তা জানার জন্যই আমার অধ্যাত্ম সাধনার

গুরু। সেই অধ্যাত্মসাধনা—যোগ সাধনার পথ প্রথম গিয়েছে জ্ঞানমার্গে তারপর ভক্তিমার্গে। কি করে যে সেই উত্তরণ সে কথা বলব বলেই তো এত অবতারণা। জ্ঞানের চাইতে ভক্তি বড়। ভক্তি অপেক্ষা প্রেম বড়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—আমি প্রেমিক নই। জ্ঞানান্বেষার পথ ধরে এখন ভক্ত। আমি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হতে চাই না—স্বকীয় সত্তা বজায় রেখে—তাঁর বিপুল বিশ্বের বৈচিত্র্য ভোগ করতে চাই।

অধ্যাত্ম অন্বেষায় যোগের পথে বড় কিছু অন্তরায় এসে যায়—যার নাম যোগক্ষেম। এই যোগক্ষেম যখন occult faculty রূপে এসে উপস্থিত হয়, তখনই বিপদ। তখন ত্রিমাত্রিক জীবের মধ্যে একটা বহু-মাত্রিক অবস্থা দেখা দেয়। সাধারণ চোখে যা অদৃশ্য তার চোখে তা ধরা পড়ে। কালের অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুইই তাঁর ক্ষীপ্র মানসগতির কাছে পরাভূত হয়। তখন নিতান্ত কৌতূহলবশে যদি কারো সম্পর্কে দু-একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলে কেউ তবেই বিপদ। গুজবের মত এপিডেমিক আকারে তা ছড়িয়ে পড়ে। তখনই লোকে লোকারণ্য। আর্ত মানুষের ভিড়—'বাঁচাও'! জগতের যে আনন্দ যজ্ঞ, cosmic dance—সে আনন্দের ভাগ কেউ চায় না। একজন যদি যোগ শিখতে চায় তো হাজার জন ভাগ্য জানতে আসে। যোগী গুরু হন। তাঁর আনন্দময় চিত্ত অহংকারের ভাবে ভারি হয়ে ওঠে। ডানাভারি পাখির মত তখনই সে পড়ে যায় নিচে। হয়তো সেইভাবেই পড়ে যাচ্ছিলাম। জানি না, তাই ঐশ্বরিক চিত্তের শাসনে জীবাত্মিক অস্তিত্বরূপে আমার এই শাস্তি কিনা—অসুখ।

লোকে শুনতে চায় না, ভাবে মিথ্যে। কেউ ভাবে এসবই অদ্ভুত কৌশল ভক্ত জোটাবার জন্য। বহুজনের ক্ষোভ চিঠিরও জবাব দিতে পারি না বলে। আসলে মিথ্যের ভেজালে বাস করতে করতে লোকে সত্য বলে কিছু যে আছে সেটা ভুলেই গেছে। জগতের কী দুরবস্থা! মানুষ আত্মিক মৃত্যুর মুখে। এই মৃত্যু থেকেই তাকে বাঁচাবার জন্য হিমালয় থেকে কোন মহা মহাপুরুষের ইচ্ছায় সহজ যোগের নির্দেশ এসেছিল

মাটিতে। কারো অহেতুক করুণায় সেই নির্দেশ এসেছিল আমারই কাছে। নির্দেশিত সেই সহজযোগের পথ অসত্য নয়—আমি তার বহু প্রমাণ পেয়েছি। সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে চিঠি পেয়েছি—শুধু বই পড়ে যিনি যোগ করে অপরূপ দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এমন এক মহিলার। এই যোগের সহজ সূত্র লাভ করে সহজেই দিব্য দর্শনের অধিকারী হয়ে যে আমেরিকান বারে বারে আমাকে চিঠি দিয়েছেন—তার চিঠিও তুলে দিচ্ছি। কিন্তু এর উদ্দেশ্য এই নয় যে গুরু হতে চাই, ভক্ত চাই। শুধু চাই এই মহান সত্য সম্পর্কে মানুষ অবগত হোক। মানুষ জানুক সে কালের বন্ধনে সীমাবদ্ধ নয়। সে অসীম, সে অমৃতের পুত্র। জগতের অণুপরমাণু থেকে ধূলিকণা পর্যন্ত সবই চিরন্তন। ঈশ্বরের 'কাম' থেকে ঈশ্বরেরই প্রকাশ। সবই ঈশ্বর। জীবে অজীবে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদের প্রশ্নটা অজ্ঞানতাজাত। কিন্তু যুগে যুগে বোধহয় উল্টোই হয়েছে। কিন্তু সে থাক···।

সবই যে নকল তাতো নয়। রত্নও তো আছে! তাদেরও পেয়েছি। তাঁরাই তো আমার চোখ খুলে দিয়ে শিখিয়েছেন—'ঈশ্বরের চোখ জাগ্রত, দেখুন।'

সত্যিই ঈশ্বরের বিচিত্র রহস্য, এবং তাঁর চোখ জাগ্রত। তাঁর পরিকল্পনার কথা অঙ্কুরেই বোঝা যায় না। নইলে দেখুন না লেখক হিসাবে আমার 'নিগূঢ়ানন্দ' নামকরণের রহস্যটাই একবার ভাবুন! ঈশ্বরের কি বিচিত্র পরিকল্পনা ছিল মনে মনে।

আমার যথার্থ নাম নিগূঢ়ানন্দ সরকার। ছোটবেলায় পাঠশালায় যখন ভর্তি হব, হেডমাস্টার বললেন, ভাল নাম বল্? বললুম। মাস্টার বললেন, এ নাম বিশ্রী, ভাল একটা নাম বল্। বললুম, আমার ভাল নাম নেই।

—তা হয় নাকি? যা বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয়। বাড়িতে পিসিমা তখন পড়ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত। আমার মা নেই। পিসিমাকেই

৩. মঞ্জুলা গাঙ্গুলী ও Jim Crutchfield-এর চিঠি পরিশিষ্টে দেখুন।

জিজ্ঞেস করলুম—আমার ভাল নাম কি?

ঠিক সেই মুহূর্তে পিসিমা সচ্চিদানন্দ শব্দটি উচ্চারণ করছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত থেকে। বললেন, যা—বলগে তোর নাম সচ্চিদানন্দ সরকার। সেই থেকে সচ্চিদানন্দ হলুম। ছুটো নামই আমার পিসিমার দেওয়া। ছোটবেলায় নাকি নিগূঢ়ভাবে ঝুম মেরে বসে থাকতুম, তাই দেখে পিসিমা আমার নাম করেছিলেন নিগূঢ়ানন্দ, নিগূঢ়ানন্দ সরকার। সেই নামের প্রতি একটা আকর্ষণ কিছুতেই যেন দূর করতে পারিনি। সেইজন্য সুযোগ পেলেই 'নিগূঢ়ানন্দ' নামটি ব্যবহার করতুম। আমার প্রথম বই একটি কাব্যগ্রন্থ। নাম 'সন্ধ্যারায়'। তার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, কল্লোল যুগের সাহিত্যিক স্বর্গত ভবানী মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখেছিলেন, 'তরুণ কবি শ্রীমান নিগূঢ়ানন্দ কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন সম্প্রতি, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা!' কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র 'নিগূঢ়ানন্দ সরকার' নামেই আমার পরিচয় দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, 'সকলেই মহাকবি হবার জন্য জন্মায় না। কিন্তু কাব্যরচনায় যে সততা আজকাল বিরল হয়ে আসছে কোথাও তার পরিচয় পেলে আশান্বিত হয়ে উঠি। নিগূঢ়ানন্দ সরকারের কবিতাগুলির মধ্যে সেই আশার ঝিলিকই সুস্পষ্টভাবে পাচ্ছি। অনুভূতি ও প্রকাশের মধ্যে তাঁর ভাষা এখনকার অনেকের মত অকারণ ব্যবধান সৃষ্টি যে করেনি এটিও বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। এই কবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনে মনে ঔৎসুক্য পোষণ করব।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র

:

দেশ লিখেছিল— 'এই কবির অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করেছি বলে মনে পড়ে না। তবে কবি শক্তিমান। লক্ষ্যে স্থির থাকলে একদা স্বপ্রতিষ্ঠিত হবেন। দেশ—৩।৫।৬০.

একদিন আমার প্রকাশকের সঙ্গে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ি গিয়েছি। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কবিকে স্বচক্ষে দেখা। বহু তরুণ

লেখকের ভিড় তাঁর বৈঠকখানায়। প্রকাশক তাঁর গ্রন্থের ফার্স্ট প্রুফ দেখাতে গেলে তিনি বললেন, 'ফার্স্ট প্রুফ দেখি না। ফাইনাল প্রুফ নিয়ে এসো।'

অনেকক্ষণ কথা বলে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বাড়ির ভেতরে ঢোকার জন্য মুখ ফেরাতে যাবেন, হঠাৎ আমার সঙ্গে চোখা-চোখি। 'কি জানি কি ছিল বিধাতার মনে' রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনটা মনে পড়ে। হঠাৎ আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

কিছু বুঝতে না পেরে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলুম।

আবার হাতের ইশারা করলেন তিনি।

—আমায় ডাকছেন?

—হ্যাঁ।

এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি আমাকে হাত ধরে বৈঠকখানার অ্যান্টিচেম্বারে নিয়ে গেলেন। বললেন, তোমার নাম নিগূঢ়ানন্দ সরকার?

আমি তো অবাক! এর আগে জীবনে কখনও দেখা হয়নি। আর, আমি লেখার জগতের সঙ্গেও তেমন জড়িত নই। আমাকে চিনলেন কি করে! বললুম, হ্যাঁ। বললেন, তোমার কবিতা আমি পড়েছি। বেশ ভাল। সম্ভাবনা আছে। আরো ভাল লেখা উচিত ছিল লিখিনি। কারণ, লোকে বলবে ব্যাক্ করছি। তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে এস। ঐ যে সব দেখছ! তেলের বাটি নিয়ে আসে রোজ রোজ। ভাল লাগে না। তুমি কিন্তু এসো।

সম্মতি জানিয়েছিলুম। কিন্তু আর কখনও যাইনি। আমার এটা সহজাত ভাব—যাকে বলে স্বভাব। কোথাও কারো কাছে বার বার যেতে ভাল লাগে না। শুধু মনে হয় ওঁরা বিরক্ত হবেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় একবার আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন আমার একটি বই বাজারে খুব বিক্রী হচ্ছে। আরো অনেক বই বেরিয়েছে। 'বেগম নয়, বাঁদী নয়', 'রাজা-বাদশার

পথের ধারে' ইত্যাদি। শৈলজানন্দ বললেন, 'তোমার ক্যানভাস অনেক বড়। একদিন দাঁড়াবে। সেইজন্য যাবার আগে তোমায় দেখে গেলুম। তারাশঙ্করকে বলেছি গন্না বেগমের কাহিনী কোথায় পেলে, নিগূঢ়ানন্দ থেকে? ও না করেছে। 'সত্যি তখন 'গন্না বেগম' ও 'একটি বেগমের অশ্রু' নিয়ে একটা আলোচনা হয়েছিল বৈকি।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে আমাকে একবার নিয়ে গিয়েছিলেন বোলপুরের এক তরুণ ভদ্রলোক। সেখানে তিনি ওঁর পি. এ.-র কাজ করতেন। সেখানে আমার পরিচয় পেতেই জিজ্ঞেস করলেন—'বড়রা কেমন ঈর্ষে করে?' অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বলে-ছিলুম, 'বড় তো আপনার আগে আর মাত্র দু'জনকে দেখেছি, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। আমাকে ঈর্ষা করবে কেন! আমি কোন কাগজে লেখার সুযোগই পাই না!' মুচ্‌কি হেসে অন্নদাশঙ্কর বলেছিলেন, 'করে।' সেটা একটা প্রসাদ অনুভব করবার মত খবর বৈকি! কিন্তু আর কখনও অতবড় একজন সাহিত্যিক অদ্যাবধি জীবিত থাকতেও তাঁর কাছে যাওয়া হয়নি। এখন কোথায় থাকেন জানি না, তখন থাকতেন যোধপুর পার্কে। শ্রীমতী রায় তখন বোধহয় পা ভেঙে বিছানায় ছিলেন। অতবড় একজন লেখক নিজে হাতে আমাদের সরবৎ করে খাইয়েছিলেন। এ একটা ক্বচিৎ সৌভাগ্য সন্দেহ কি? তবুও আমার সাহিত্যিকও হওয়া হয়নি, অন্নদাশঙ্করের মত মনীষী ব্যক্তির কাছেও আর যাইনি।

একবার টালিগঞ্জের রসা রোডের ডঃ জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জীর সঙ্গে সাহিত্যিক বিমল মিত্রের কাছে গিয়েছিলুম। ডঃ চ্যাটার্জি রবীন্দ্র সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গত চিন্ময় চ্যাটার্জির দাদা। ডাক্তারবাবু আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। বললেন, চল, বিমলবাবুর ওখানে যাচ্ছি। মুখোমুখি একবার তাঁকে দেখতে পাবে। তবে পরিচয় দেব না। কারণ একটু নাক উঁচু আছে। তোমাদের নিশ্চয়ই লেখক বলে গ্রাহ্য করেন না।

কিন্তু নিয়তির পরিহাস আমরা ক'জন আগে থাকতে বুঝি! ডাক্তার-বাবু ভুলক্রমে আমার পরিচয়টাই দিয়ে ফেললেন—বললেন, ও লেখে,

'নিগূঢ়ানন্দ' ছদ্ম নামে। এই ছদ্ম নামের পেছনের ঘটনাটিই বেশ মজার। এবং সেটাই বোধহয় ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল। সে কথায় পরে আসছি।

আমার নাম শুনেই বিমলবাবু বললেন, আরে তোমার আসল নাম কি?

—সচ্চিদানন্দ সরকার।

—তোমার কথাই আলোচনা হচ্ছিল। 'মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে' পড়বার পরই তোমার আসল নাম জানার চেষ্টা করছি। ইংরাজীতে অনুবাদ কর না কেন? বেশ চলবে।

বলে কি! আমার নাম বিমল মিত্র জানেন, সে তো ভাবতেই পারি না!

—কি করা হয়?

—অধ্যাপনা!

—আমার ঐতিহাসিক বইয়ের মধ্যে কোনটা বেস্ট বলে মনে হয়?

—'সাহেব বিবি গোলাম'।

—বেগম মেরী বিশ্বাস নয়?

—না।

—কেন?

—সাহেব বিবি গোলামে যথার্থ একটি যুগের ইতিহাস রয়েছে।

শেষপর্যন্ত বিমল মিত্রের মত সাহিত্যিক আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাস্তায়ই নেমে এলেন!

ডাক্তারবাবু, অর্থাৎ ডঃ জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি তো অবাক। রাস্তায় আসতে আসতে বললেন, আশ্চর্য! বিমলবাবু তোমাকে স্বীকার করলেন! আমাদের ওখানে প্রায়ই যান। চিন্ময়ের সঙ্গে (চিন্ময় চ্যাটার্জি) খুব খাতির। উনি তো কাউকে লেখক বলেই মানতে চান না।

আশ্চর্য! বিমল মিত্রের কাছেও আর কখনও আমার যাওয়া হয়নি। যাওয়া হয়নি, আমি সাহিত্যিক হব না সেইজন্য। সাহিত্যিক হব না বলেই আমি নিগূঢ়ানন্দ সরকার হলুম—পদবীহীন 'নিগূঢ়ানন্দ'। মহারাজ

মহারাজ গন্ধ গায়ে মেখে কেমন রহস্যময় হয়ে দাঁড়ালুম। এবং যথার্থ ই আজ চিঠি পাই 'স্বামীজী' সম্বোধনে। বিধাতার পরিহাস কে বোঝে! ভবিষ্যতে অধ্যাত্মজগতের উপর বই লিখব বলেই বোধহয় বিধাতার বিচিত্র কৌতুকে আমার পদবী হারালুম এবং 'শ্রী'-ও।

যে প্রকাশক কবিতার বই ছেপেছিলেন তিনিই আমাকে দিয়ে একটি উপন্যাস লেখালেন। উপন্যাসের নাম 'সবুজ মাঠের ইতিকথা'। লেখকের নাম নিগূঢ়ানন্দ সরকার দেওয়াতে বললেন, দেখুন সরকার টরকার টাইটেল থাকলে বই চলবে না। দাস, সরকার, এসব সাহিত্যের ক্ষেত্রে অচল। মূলত এ জগৎটা বামুনদেরই, তাই তিনি বাড়ুজ্জে হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছেন—তারাশঙ্কর, মানিক আর বিভূতি। সুতরাং পদবীটা বাদ দিন তাতে যদি চলে। সেই থেকে নিগূঢ়ানন্দ সরকার হলুম 'নিগূঢ়ানন্দ'। বিধাতার মনের পরিকল্পনা অনেক 'আগের আমি' জানতুম না এই যা। সেইজন্য মিষ্টি ঐতিহাসিক কাহিনী, উপভোগ্য ভ্রমণ কাহিনী ও বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক উপন্যাস লিখেও—শেষপর্যন্ত স্বামীজী অভিধাতে ভূষিত।

আমরা ঈশ্বরের বিচিত্র খেয়ালের কথা জানতে পারিনি বটে, কিন্তু একজন পেরেছিলেন তিনি বালির বেণুদা—জ্যোতিষী ননীগোপাল ভট্টাচার্য। একদিন তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন কলেজ স্ট্রীটের বিখ্যাত আয়কর আইন বিশারদ দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

গিয়েছিলাম—লেখক হিসেবে কোনদিন আমার ভাগ্য খুলবে কিনা সেটা জানতে। কারণ তিনিই আমার 'মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে'র প্রকাশক। যদিও বহু বড় বড় জ্যোতিষবাক্য শুনেছি, প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, কিন্তু কোনটাই ফলেনি। তবুও আরেকজনের কাছে যাবার লোভ সামলাতে পারিনি। এ যে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের দুর্বলতা। এড়াব কি করে! দুর্বল চিত্তের কাছে জ্যোতিষীর হাতছানি পাতাখোরের পাতার মত। তবে দুলালবাবু বেণুদার ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ তৈরি করেছিলেন—এই কথা জানিয়ে দিয়ে যে, শুধু তিনি হস্তরেখাবিদ নন

—অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। হাত দেখে এমন কথা বলেন যা অন্য কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আসলে ভবিষ্যৎ-বক্তাদের বলা হয় Divinator অর্থাৎ Divine World-এ প্রবেশ করে যাঁরা সব কিছু দেখতে পান। তথাকথিত Astrology বলে যে একটা শব্দ আছে তা গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে বিচার জাতীয় শাস্ত্র হলেও যাঁরা শুধু একে আমাদের সৌরমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন তাঁরা কখনই যথার্থ ভবিষ্যৎ-বক্তা হতে পারেন না। কারণ, এখানে যুক্ত রয়েছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ইদানিং বিজ্ঞানই এটা প্রমাণ করেছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও যদি ধরা যাক কোন ছায়াপথ, সৌরজগৎ ইত্যাদি ডুবে যায়—বিশ্বের সর্বপ্রান্তেই তার প্রভাব পড়ে। পৃথিবী, পৃথিবীর জীব তারাও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। যারা এই বিশ্বছন্দের—Cosmic Dance-এর স্বরূপ নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতে পারবেন না কালের উপর কখনই তাঁদের হাত থাকতে পারে না। এজন্য যা প্রয়োজন তা দিব্যক্ষমতা, যোগীরা যোগবলে যে ক্ষমতা অর্জন করে থাকেন। বেণুদা দীর্ঘসাধনার বলে এই ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন বলেই তাঁর কাছে যাবার লোভ সংবরণ করতে পারিনি। তবে দিব্যক্ষমতাও বেশি ব্যবহার করলে ফুরিয়ে যায়। একমাত্র পরমশূন্যতা ছাড়া নির্ভেজাল কেউ নয়। সুতরাং যোগিদেরও ভুল হতেই পারে এবং হয়। তবে বেণুদা অন্তত একটা ক্ষেত্রে আমার জন্য ভুল করেন নি—অর্থাৎ তথাকথিত সাহিত্যের জগৎ যে আমার জন্য নয় একথা জানিয়ে দিতে ভোলেন নি। হাতের দিকে তাকিয়ে এমন সব কথা বলেছিলেন হাতের রেখায় তা কখনও থাকে বলে আমার বিশ্বাস নয়। এ ধরনের কথা বলা সম্ভব যাঁদের Occult Faculty আছে তাঁদেরই। অভিভূত হয়েছিলুম সন্দেহ নেই। তবে ব্যথাও পেয়েছিলুম প্রচণ্ড কারণ, তিনি আমার স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, আমি কখনও সাহিত্যিক হতে পারব না—তা যত ভালই লিখি না কেন। কোন কাগজ টাগজেও ঠাঁই পাব না। বস্তুত অনেক সাধ্যসাধনা করে দেখেছি কিন্তু কোন কাগজের দুয়ার আমার জন্য খোলেনি। শুধুমাত্র কৃপা করেছিলেন

তখনকার দিনের মাসিকপত্র ভারতবর্ষের সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মাসিক বসুমতিতে একবারই একটা উপন্যাস বেরিয়েছিল আর নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনী সব লিখেছিলুম। প্রকাশকেরা প্রকাশও করেছিলেন, কিন্তু যাকে বলে সাহিত্যের আভিজাত্য তা কখনও কপালে জোটেনি।

বেণুদা বলেছিলেন, 'আমার জন্য যা অপেক্ষা করে আছে, তা অধ্যাত্ম জগৎ। অধ্যাত্ম সাহিত্য। তাই লিখতে হবে।' মা অর্থাৎ জগজ্জননী মা নাকি আমাকে দিয়ে তাই লেখাবেন।

কিন্তু আমার চোদ্দপুরুষে কেউ সেভাবে ধর্মকর্ম করেছে বলে তো শুনিনি! বালবিধবা পিসিমা আমাদের কাছেই থাকতেন। তিনি নিত্য কালীপূজো করতেন। সন্ধ্যাবেলা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন। তাঁর আসনে তাঁর গুরুদেবের একজোড়া কাষ্ঠপাদুকা ছিল এই যা। এর বাইরে ধর্মকর্ম তেমন দেখিনি। বাবাকে শুনতুম ভোরবেলা গীতা মুখস্থ বলতেন রোজ। স্বদেশী করার সময় গীতা মুখস্থ করেছিলেন সেই থেকে আবৃত্তি করা অভ্যাস—এই যা। উত্তরাধিকারসূত্রে অধ্যাত্মতা লাভ করব তেমন কিছু ছিল না। তবে পূর্বজন্ম বলে একটা কথা আছে। তখন যদি কিছু থেকে থাকত। কিন্তু বেণুদা যা-ই বলুন আমি বিশ্বাস করিনি। বরং দুঃখ পেয়েছিলাম। যে-লোক প্রেমের কবিতা লিখবে তাকে যদি ভক্তিসঙ্গীত লিখতে হয়—কেমন হয় বলুন!

কিন্তু নিয়তির পরিহাস এড়াবে কে? একদিন বাড়িতে এলেন হিমালয় থেকে এক মহাপুরুষ। এলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। শুধু বললেন, পৃথিবীর শেষ সময়। সহজ যোগতত্ত্ব প্রচার করতে হবে। ব্যস্! ঐটুকু। আর কিছু নয়। কে করবেন প্রচার, কি ভাবে করবেন—কিছুই নয়। যেমনই এসেছিলেন তেমনই চলে গেলেন।

শেষে দেখা গেল আমিই যোগ করছি। প্রথম ধ্যানে বসেই অলৌকিক! লোকে বলবে—এ আমার পূর্ব জন্মের অভিজ্ঞতা। আমি বলব—মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপা—ঈশ্বরের অপার করুণা। আসলে

সবকিছুই যে পরম মানসের অদৃশ্য পরিকল্পনার মধ্যে থাকে—বুঝব কেমন করে! নইলে প্রফুল্ল রায়ের মত অতবড় সাহিত্যিক তাঁকেই কেন পেয়ে যাব—'দিব্যজগৎ ও দৈবী-ভাষার' প্রথম খণ্ডের ভূমিকালেখক হিসেবে। প্রফুল্লবাবুর প্রচণ্ড আগ্রহ অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি। ছাপানো ফর্মা পড়েই ভূমিকা লিখে দিলেন—মূল্যবান ভূমিকা। অবিশ্বাস্য ব্যাপার ১৭ দিনেই বোধহয় প্রথম সংস্করণ শেষ। সাহিত্যের জগতে ঢুকতে পেলুম না বটে কিন্তু পাঠকের চিত্তে আলোড়ন হল বেশ। এই প্রফুল্লবাবুই আরো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন—'মৃত্যু ও পরলোক' গ্রন্থের উপর বই মলাটে মন্তব্য লিখে দিয়ে। প্রফুল্লবাবুর মত অত বড় মাপের লেখক—বইটির উপর এমন মন্তব্য করবেন ভাবতেই পারিনি। লিখলেন—"মৃত্যু মানুষের এক অনিবার্য পরিণতি। এর সঙ্গে সঙ্গে কি সে একেবারে বিলুপ্ত হয়? নাকি অদৃশ্য স্পর্শাতীত কোন স্তরে তার সূক্ষ্ম অস্তিত্ব থেকে যায়? 'মৃত্যু ও পরলোক' গ্রন্থে নিগূঢ়ানন্দ এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন নিরাসক্ত দার্শনিকের মত।···বলতে দ্বিধা নেই তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। 'মৃত্যু ও পরলোক' গ্রন্থে মৃত্যু ও মৃত্যুর পর প্রাণের রূপান্তর এবং নতুন আবাসে তার অবস্থান সম্পর্কে তিনি এমন কিছু জানিয়েছেন—যা পাঠককে নতুন করে জীবন-মৃত্যুর অনাবিষ্কৃত রহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু করে তুলবে।' এসব যদি সাজানো ব্যাপার না হয় তবে কি? আমি যোগ জানি না যোগ করলুম। কখনও ধর্মগ্রন্থ পড়িনি—ধর্মগ্রন্থ লিখলুম। লোকে বললেন, পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তেমন লেখাপড়া করিয়ে লোকই আমি নই। কিন্তু কি আশ্চর্য, যখন যে-বই আমার বক্তব্য প্রকাশের জন্য দরকার তা দেখি আমার হাতে এসে যাচ্ছে। আড়ালের একটা মহামানসের খেলা যদি এটা না হয়, তবে কার?

বর্তমান বিজ্ঞান যে অধ্যাত্ম সাধনার কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে—এ খবর আবার দিয়েছিলেন অধ্যাত্মতায় যিনি বিশ্বাস করেন না—সেই ডঃ জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি। তিনিই আমায় পড়তে বলেছিলেন, Fritjof Capra-র Tao of Physics. ততক্ষণে যোগে বিশ্বজগতের বিচিত্র সব

জিনিস দেখতে শুরু করেছি। এই প্রকাশ যদি নির্ভেজাল অনুভবজাত ভাবের প্রকাশ হয়, তাহলে লোকে নেবে না। বিজ্ঞানের প্রমাণ চাই।

একের পর এক বিজ্ঞানের বই এসে যেতে লাগল হাতে। বিজ্ঞান বুঝি না। আমার কট্টর সমালোচক বস্তুবাদী বন্ধুরাই ব্যাখ্যা করে দিতে লাগলেন দুরূহ পদার্থ বিজ্ঞানের গ্রন্থের। কোথা থেকে পুরাতত্ত্বের বই-গুলো এসে হাজির হতে লাগল লেখকের সংগ্রহে। গোষ্পদের যেন সাগর হয়ে ওঠার উপক্রম। কত যে বই এসে জুটল কে জানে! এত বই সংগ্রহ করার মত আর্থিক অবস্থাই আমার নেই। তবু জুটল।

প্রাক্তন আই. জি. ডঃ সত্য লস্কর সবচেয়ে বেশি সাহায্য করলেন দুটি অমূল্য গ্রন্থ পড়তে দিয়ে—Sheila Ostrander ও Lynn Schroeder-এর Psychic Discoveries Behind the Iron curtain ও Peter Tompkins ও Christopher Bird-এর The Secret Life of Plants পড়তে দিয়ে। আমার অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে কত যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ পেলাম সেখানে—কী বলব! সত্যি, পরমাত্মার জাগ্রত চক্ষু, যখন যা প্রয়োজন তখনই তাঁর মানস-নাটকের নির্দিষ্ট চরিত্রের জন্য তা জুটিয়ে দেন। পুলিশের লোক হয়েও অধ্যাত্ম সত্য জানার এমন আগ্রহ সত্যবাবুর চেয়ে কম লোকের ক্ষেত্রেই দেখেছি আমি। সত্যবাবুর নিবিড় বিশ্বাস—এই বিপর্যস্ত পৃথিবীতে একদিন ঈশ্বরের আশীর্বাদে সুস্থতা ফিরে আসবেই। সেই ঐশ্বরিক মানসকে জানার জন্য যা প্রয়োজন তা যোগ। সেই যোগজ্ঞান চাই।

ভারতবর্ষের বিশ্বাস নামকরণ হয় জাতকের চরিত্র হিসাবে। এই জন্য জাতকের জন্মলগ্ন দেখে তার চরিত্র বিচার করে তবে নামকরণ হয়। সত্যবাবুর নাম সার্থক। সত্যান্বেষাই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য—বাইরে তাঁর ব্যবহার যা-ই হোক না কেন।

অনেক সাহায্য আমাকে করেছেন ডঃ সত্য লস্কর। কিন্তু আমি অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তিনি রিটায়ার করে চলে

গেছেন সন্টলেকে। তবে খবর রাখেন, চিঠি দিয়ে আমাকে জানিয়েছেন।

আশ্চর্য! এদের সহযোগিতায় যেমন প্রচার হয়েছে আমার তেমনই আমার গ্রন্থের। কিন্তু ঈশ্বর বুঝি গণৎকার হই এটা চাননি। তাই ভিড় যখন উপচে পড়ছে ঠিক তখনই দিলেন অসুখ। এমন অসুখ দীর্ঘদিন লোকের সঙ্গে দেখা করা চলবে না। চাই বিশ্রাম — স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সমস্তরকম চেষ্টা। চাকুরি রক্ষা করে মুখের অন্ন জোটাতে পারব কিনা এই যখন ভারছি — তখনই পরমাত্মা তাঁর সর্বব্যাপ্ত দৃষ্টির অদ্ভুত পরিচয় দিয়ে বিহ্বল করে দিলেন আমাকে।

তিন

যখন অসুস্থ। হাতে ধরতে গেলে চিকিৎসার অর্থই নেই ঠিক সেই সময় ঈশ্বরপ্রদত্ত পুরুষের মতই এগিয়ে এলেন ডঃ পৃথ্বীশ চন্দ। পৃথ্বীশ চন্দের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আমারই সহকর্মী অধ্যাপক শুভেন্দু বারিক। শুভেন্দুর বড় গুণ পরের সেবা। বারবার এজন্য আঘাত সে কম পায়নি। তবু পরের সেবা করা যেন ওর সহজাত ধর্ম। আমার অসুখের যখন সূত্রপাত তখনই শুভেন্দু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ডঃ চন্দের কাছে। এমন অমায়িক চরিত্রের ডাক্তার সত্যিই দেখিনি! এত বিদ্বান, এত গুণ, অথচ এত নিরভিমান! সামান্য কী একটু পরিচয় হয়েছিল তাতেই ধারণা আমার নাকি দিব্যজগতে প্রবেশের ছাড়পত্র আছে। আমার বইগুলো দেওয়াতে সেগুলি পড়ে আরো বেশি রকমের ভক্ত হলেন বোধহয়। বললেন, যোগ শিখব।

আমার যোগে তো চিরাচরিত প্রথার কসরৎ নেই। নাক টেপা-টিপিও নেই। মূলত এ হল মতস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার উপর লিখিত। এর মূলসূত্রে কাজ করেছে ফ্রয়েডের ড্রীম থট্। অথচ কী আশ্চর্য ফ্রয়েড যোগ ব্যাপারটাকে তেমন আমল দেননি। পরবর্তী কালে আমেরিকাতে মহেশ যোগীর T.M. – Transcendental Meditation-এর উপর পরীক্ষা করে আমেরিকানরা জেনেছেন যে, অস্থির মানসিকতার উপর এর বিরাট প্রভাব রয়েছে। কেন রয়েছে, কি ভাবে রয়েছে – সে ব্যাখ্যা মহেশযোগী করেন নি। উদ্‌ভ্রান্ত মানব জীবনের ক্ষেত্রে এর যথার্থতা রয়েছে বুঝতে পেরেই আমেরিকানরা তাঁকে বিপুল স্বীকৃতি দিয়েছেন। অথচ গোপন সূত্রটা কিন্তু পাশ্চাত্য মানসিকতার মধ্যেই ছিল। ভারতের মত অতি প্রাচীন কাল থেকেই তার মানসিকতাতে এই সূত্রটি ধরা না পড়লেও ফ্রয়েডীয় মানসে ঊনবিংশ শতকেই ধরা পড়েছিল।

যাই হোক ডঃ চন্দ যোগ শিখেছিলেন। কাজের মানুষ। হয়তো তেমন সময় দিতে পারেন নি। তাই একটু দেরী হয়েছিল মনের বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে প্রবেশ করতে। মাঝে মাঝে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। যেমন—তাঁর বড় শখ ছিল অধ্যাপনা করার—সেই অধ্যাপনা তিনি করতে পারবেন কিনা ইত্যাদি। এখন তিনি NRS-এর অধ্যাপক। মাঝে মাঝে দু-একজন বন্ধুবান্ধবকেও আমার কাছে এনেছেন। সকল মানুষেরই যে দুর্বলতা অজ্ঞাত ভাগ্য সম্পর্কে জানা—ব্যাপারটা তাই আর কি। তবে নিজে অত বড় ডাক্তার হলেও নিরেট বস্তুবাদী নন। অতীন্দ্রিয় একটা কিছু ব্যাপার আছে, এতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

এহেন যে ভাল মানুষ তাঁর কপালেও ঈশ্বর কী বেদনাই না লিখে রেখেছিলেন! যে ঈশ্বর চায়, তাকে কি সত্যিই দুঃখ পেতে হয়? এই প্রবাদ বাক্যটিই কি চূড়ান্ত—"আমারে যে করে আশ, তার করি সর্বনাশ?" থার্ড ইয়ারে ডাক্তারী পড়া তাঁর একমাত্র ছেলে দীঘায় বেড়াতে গিয়ে জলে ডুবে মরল। ঈশ্বরকে আশা করলে এমন করে তিনি ভক্তের সর্বনাশ করেন কেন? তা কি এই জন্য যে, তিনি ভক্তের সকল বাসনার উৎসগুলিকে ধ্বংস করে তাঁকে নিষ্কাম ঐশ্বরপ্রেমের আনন্দ দিতে চান? মোক্ষ দান করতে চান?

আমি তখন বস্তুত চলতেই পারি না। শুভেন্দু খবর দিল। যেতে পারলুম না। শেষে আমি যখন আর উঠতেই পারি না, ডাক্তার নিজে এলেন আমাকে দেখতে। বললেন, আপনাদের মত মানুষের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। তীব্র বেদনার মধ্যেও শেফালী ফুলের মত পৃথ্বীশবাবুর হাসি জীবনে আমি ভুলব না। বললেন, আপনার সঙ্গে আমার এত পরিচয়, অথচ আমার ছেলে সম্পর্কে আগে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। ছেলে ও মেয়েকে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিইনি। মুখে হাসি কিন্তু শেফালী পাপড়ির উপর শিশিরের মত অশ্রু টলমল করছে।

সান্ত্বনা দেবার ভাষা তো আমার নেই। এখানেই অদৃশ্য একটা নিয়তির হাত মেনে নিতে হয়। অবধারিতকে আটকাবার কোন পথই

থাকে না ! ঈশ্বর এত দুঃখ দিয়ে আমাদের কী বোঝাতে চান ? জানি না কী বোঝাতে চান। কিন্তু এই চরম প্রশ্নটির জবাব পাবার জন্যই অধ্যাত্ম জগৎ সম্পর্কে আমার এমন অনুসন্ধিৎসা।

এই প্রশ্নটিরই চূড়ান্ত জবাব আমাদের জানা প্রয়োজন। মৃত্যুর পর কিছু কি থাকে ? যদি থাকে কোথায় থাকে, কেমন করে থাকে, সেটা যদি মানুষ সন্দেহের অতীত ভাবে জানতে পারে—তাহলে একটা সমস্যা তার দূর হয়। যদি মৃত্যুর পরের অবস্থা ইহলোকের কর্মের উপর নির্ভর করে—তাহলে মানুষ যে ধরনের কাজ যন্ত্রণার কারণ হবে না, সেই ধরনের কাজই করবে। এই অনৈতিকতা-দুষ্ট পৃথিবীতে তখন নৈতিক সাম্য থাকবে। মানুষ সহস্র দুর্বল চিত্তের উপর দর্পিত পদক্ষেপে চলতে গিয়ে অজস্র আর্ত কান্নায় পৃথিবীকে ভরে দেবে না। রুদ্ধশ্বাস suspensive উপন্যাসের কাহিনীর মত প্রচণ্ড কৌতূহলে শেষ পাতা আবিষ্কারের জন্য এগিয়ে যাবে। আর যদি জানে কিছু থাকে না তাহলে একটা স্বস্তি অবশ্য পাবে যে, যা কিছুই সে করুক না কেন, ইহজীবনের বাইরে তার জন্য অন্যরকম ভোগান্তি কিছু নেই। স্টিফেন স্পেণ্ডারের সেই কবিতার মত—'Oh love the interest itself in thoughtless heaven.' অর্থাৎ যতই ভালবাসো না কেন—ভোগ করলে এখানেই করতে হবে, পরলোকে এর কোন ডিভিডেণ্ড পাবে না।

কিন্তু গোল বাধিয়েছেন তাঁরাই যাঁরা বলেছেন বস্তুজগতের স্থূল জীবনই শেষ নয়, আরো আছে। স্থূলদেহের মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম একটা জগৎ আছে। সে জগতে চেতনার মাত্রা অনেক বেশি। তবে মনের বাসনা যার যেমন সেই আত্মিক অবস্থাতেই সে সেখানে বাস করে। দুঃখের মানসিকতায় দুঃখের জীবনই পাবে। কামনাবিধ্বস্ত মানসিকতায় ইহলোকের কামনাবাসনার যন্ত্রণাই সে ভোগ করবে। কিন্তু কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে অনন্ত জ্ঞানের পথে সত্যের সন্ধানী হয়ে যে ধাবমান সে মহাকাশে মহাবিশ্বের লীলা প্রত্যক্ষ করে আরো শিহরিত হবে। দেখবে জীবন শুধু পৃথিবীর সীমিত মাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আরো

অসংখ্য গ্রহে প্রাণ আছে, বিচিত্র প্রাণের নৃত্য আছে, মানসিকতার বিচিত্র প্রবাহ আছে। মৃত্যু হবার আগেই যাঁরা মানসিকতার সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়ে এই বিপুল মহাবিশ্বকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা মৃত্যুকে ভয় পান না। যাঁরা জেনেছেন যে, মৃত্যুর পর জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহে অনুরূপ ভাবেই বিচরণশীল তাঁরা মৃত্যু নিয়ে আর ভাবেন না। কোন শোকও প্রকাশ করেন না। মৃত্যুই হল মানুষের সবচেয়ে বড় ভীতির কারণ। কিন্তু জীবাত্মার স্বরূপ জেনে মানুষ যখন বুঝবে স্থূল মৃত্যুতেই সব শেষ হয় না —তখন এই মৃত্যুভীতি আর তার থাকবে না।

আমাদের দেশের যথার্থ সাধুসন্তদের মৃত্যুভীতি নেই, কারণ তাঁরা মৃত্যুর পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। শোনা যায় পরম সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে হেসেছিলেন! সাধারণ লোকে তখন ধারণা করেছিলেন যে, তিনি পাগল হয়ে গেছেন। আসলে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, যিনি ইহলোকে নেই, তিনি হারিয়ে যাননি, অন্যলোকে আছেন। আমরা যারা অন্ধ তারা দেখতে না পেয়ে শোক করছি। মানুষের এই অজ্ঞানতাই যথার্থ অন্ধতা। এ-জন্যই মানুষ এত অসহায়। অথচ এই প্রকৃত অসহায়তা দূর করতে তার প্রয়াস কৈ? মানুষ অমৃতের পুত্র, ভারতের এই মর্মবাণী ক'জন ভারতীয় আজ বুঝতে পারেন?

সাময়িক মৃত্যুর হাত থেকে ইওরোপ আমেরিকাতে যাঁরা ফিরে এসেছেন—তাঁরা দেহে ফেরাটাকেই যন্ত্রণার কারণ বলে মনে করেন। দেহ হল তাঁদের মতে কারাগার। আত্মার স্বেচ্ছাবিহারী গতিকে সে রুদ্ধ করে দেয়। এই সব ব্যক্তি দ্বিতীয়বার মৃত্যুকে আর ভয় পান না।

আমি এখন একটা বই পড়ছি—Embraced by the Light. লিখেছেন Betty. J. Eadie. তিনি লিখেছেন—মৃত্যু হল নব জন্ম, বৃহত্তর জ্ঞানের জীবনে জন্ম, যে জ্ঞান সময়ের বুক ধরে সামনে এবং পেছনে ছড়িয়ে রয়েছে।[১] মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহে বেট্রির যা মনে হয়েছিল

---

১. **I saw that death was actually a 'rebirth' into a greater life**

তা হল – অমি ফিরে এসেছি, শেষ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে এসেছি।[২]

Melvin Morse M. D. Betty-র এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রায় কুড়ি বছরের গবেষণা এটাই প্রমাণ করেছে যে, এই অভিজ্ঞতাগুলি স্বাভাবিক। স্বাভাবিক ভাবেই হয়। মস্তিষ্কের যে অংশে এই অভিজ্ঞতা হয় – তাও পরীক্ষা করে দেখেছি। সাময়িক মৃত্যুর অভিজ্ঞতাগুলি যথার্থই সত্য – ভ্রান্তি দর্শন নয়। সাধারণ মানুষের দেখার মতই এগুলি সত্য। অঙ্কের মত, ভাষার মত সত্য।[৩] তবে Embraced by the Light-এ Betty অনেক অংশই যে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস থেকে লিখেছেন, অভিজ্ঞতা থেকে লেখেননি – তা বেশ বোঝা যায়। তবে কথা হল এই যে, Betty একা নন, সাময়িক মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসে বহুজনেই অনুরূপ অভিজ্ঞতার কাহিনীই বর্ণনা করেছেন। যোগদর্শনে সূক্ষ্ম জগতে আমার যে অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্য পরলোকতত্ত্বের সঙ্গে সবটাই তার সঙ্গে মেলে না। অন্ততঃ মৃত্যুর পর স্বাভাবিক তিনটি স্তরে আত্মা কামনাবাসনার ভারে পীড়িত হয়ে স্থূল জগতের অধিবাসীর মতই যন্ত্রণা ভোগ করে। তাদের গতিবিধি অনেকটাই

---

of understanding and knowledge that stretched forward and backward in time. Betty. J. Eadie. Embraced by the Light – P. 31-32

২. I'am home, I am home. I am finally home. Betty. J. Edie, Embraced by the Light – P. 41

৩. Almost twenty years of scientific research has documented that these experiences are a natural and normal process. We have even documented an area in the brain which allows us to have the experience. That means that near-death experiences are absolutely real and not hallucinations of the mind. They are as real as any other human capability, they are as real as math, as real as language – Melvin Morse M. D.

বাধাবন্ধহারা হলেও—স্বাধীনভাবে আত্মা বিচরণ করতে পারে না, মানসবৃত্তের সীমিত জগতের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। যেমন গৃহবলিভুক পারাবতগুলিকে আকাশে মুক্তি দেওয়া হলেও অভ্যস্ত খোপের ভেতর ফিরে আসে ঠিক তেমনই।

যোগের চোখে দেশের নানাস্থানেই সূক্ষ্মসত্তার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ডাক্তার চন্দের স্ত্রী তিনিও চিকিৎসক ও M. D.—এই সূক্ষ্মসত্তার পরিচয় পাবার জন্য লেখকের সূত্র ধরে সহজ যোগ করছেন। অনেক কিছুই তাঁর নজরে পড়ছে, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। নিজের ভেতর চোখ বুজে ডুব দিয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখেও তাঁর মনে হচ্ছে এ কোন মানস প্রক্ষেপণ জাতীয় কিছু। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন পরলোকগত সন্তানের সূক্ষ্ম দেহ যদি দর্শন করা যায়, তার কোন মনের বাসনার কথা যদি জানা যায়! সন্তানের সূক্ষ্মদেহের দর্শন তিনি পেয়েছেন, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। আরও প্রমাণ চান। কখন কোন্ মুহূর্তে যে এটা ঘটবে বলা কষ্টকর। রামচন্দ্রের জন্য শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে বসে থাকতে হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সূক্ষ্মলোক তাঁদের দর্শন হোক। তাঁরা পরলোকগত সন্তানের সূক্ষ্মদেহ দর্শন করে জানুন যে, মৃত্যু বলে কিছু নেই, আছে রূপান্তর মাত্র। তাঁদের আত্মজবিয়োগ দুঃখ দূর হোক।

যে ভাবেই হোক, বর্তমান গ্রন্থ লেখকের একটা occult faculty আছে, একথা জেনে কত যে মানুষ তার সঙ্গে দেখা করেছেন তার ঠিক নেই। যোগ শিখেছেন মুষ্টিমেয়। নিজেদের ভাগ্যের প্রশ্ন নিয়েই হাজির হয়েছেন সহস্রজন। শেষপর্যন্ত লেখকের অসুস্থতাই ভাগ্যার্থীদের সঙ্গে দেখা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু আসেন হয়তো বিধাতা-নির্দিষ্ট হয়েই। নইলে তাঁদের সঙ্গে সংশ্রব লেখক রেখে দেবেনই বা কেন? মানুষে মানুষে সম্পর্কের পেছনেও একটা সর্বজ্ঞাত মানসের নিজস্ব মর্জি আছে—আমরা সেটা বুঝতে পারি না এই যা। আমাদের অজ্ঞতাই আমাদের অহংবোধের কারণ। সে জন্যে প্রতিটি কাজকেই আমরা

আমাদের স্ব-ইচ্ছাজাত কাজ বলে মনে করি। বস্তুত সবই এক মহা-মানসের বিচিত্র ইচ্ছা—যে মহামানসই আমাদের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে সীমিত হয়ে, সর্বব্যাপ্ততা হারিয়ে এই 'সীমিত আমি' করি, 'সীমিত আমি' ভাবি এমন মনে করে। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা তেমন নয়। যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছিল, তাদের বহুজনের সঙ্গেই এখন দেখা করা অসম্ভব। কিন্তু যাদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, সেটা মহামানসের কোন বিশেষ ইচ্ছার জন্যই, সেই বিশেষ ইচ্ছা কি—ঘটনাপ্রবাহই তা বলে দেবে।

মেমসাহেবের মত দেখতে এক মহিলা, সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত স্বামী, নিতান্তই সাধারণ দেখতে মেয়ে। একদিন এলেন লেখকের কাছে। কিছু যে জানতে এলেন তা নয়। সম্ভবত কৌতূহলবশতঃ। সেই থেকে আস্তে আস্তে পরিচয়। কিছু জানতে না চাইলেও আমিই বললুম মহিলাকে, দেখতে তো মেমসাহেবের মত। শরীরের রঙ দেখি নীল। বাতজ বেদনায় তো অচল হয়ে পড়ার কথা!

মহিলা বললেন, পড়েছিলুম। হিমালয়ের এক সাধু ভাল করে দেন। আবার বোধ করছি।

—কিছু জানতে চান?

—না।

—তবে এসেছেন কেন? কৌতূহলে? সাধু দেখতে?

—কতকটা তাই।

—কিন্তু আমি তো সাধু নই, জ্যোতিষীও নই, তবে অধ্যাত্ম জগৎটাকে ভালবাসি। যাক এসেছেন যখন তখন বলি একটা শঙ্খিনী সাপের হাড় পরবেন, ব্যথা যাবে।

ওঁর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললুম, কি করেন?

—সামান্য একটু ব্যবসা।

—হাতে একটি পান্না পরবেন, ভাল হবে।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললুম, এ মেয়ে তো মেয়ে নয়?

—কেন ?

—এ যে ঈশ্বরী পাটনীর নেয়ার নৌকোয় ওঠা মহিলা, একস্ট্রা ব্রিলিয়ান্ট।

—ওর কি হবে বলুন ?

—ওর তো এদেশে লেখাপড়া হবে না, যেতে হবে আমেরিকায়।

—পারবে যেতে ?

—নিশ্চয়ই।

সেই মেয়েটি আজ সত্যি আমেরিকায়। এশীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রেকর্ড করে আজ চমক সৃষ্টি করেছে। পুরস্কারও পেয়েছে। পদবীটা বলা যাক—দাশগুপ্ত। আর নয়। কারণ অনেক সময় নাম করতে নেই। সুতরাং তার মেমসাহেবের মত মায়ের নামও উহ্য থাক। আর ভদ্র-লোকের নাম তো আজ ভারতীয় ব্যবসার জগতে সবারই পরিচিত। কনসাল্টেন্সি জগতে বোধহয় এক নম্বর মানুষ। প্রতি সপ্তাহেই বোধহয় ইউরোপ আমেরিকায় যান। সেই প্রথম পরিচয়ই নিবিড়তর হয়ে এখন আত্মীয়তায় দাঁড়িয়ে গেছে। অথচ কী ক্যামোফ্লেজিং লোক! এত বড় ডাকসাইটে মানুষ, থাকেন সাধারণ মানুষের মত। পরিচয় না করিয়ে দিলে বোঝার উপায় নেই!

অনেকদিন তো ধরতেই পারিনি। একদিন জিজ্ঞেস করতে কোথায় কাজ করেন নাম বললেন না। শুধু বললেন, সামান্য একটা কনসাল্টেন্সি প্রতিষ্ঠানে।

ব্যস ঐ অব্দিই। এর বেশি তিনিও জানাতে চাননি আমিও না। তাছাড়া ব্যবসার জগতে কনসাল্টেন্সি ব্যাপারটা কি—আমি তার বিন্দু-বিসর্গও জানি না। আর আমার স্বভাব অনুযায়ী আমি অন্য দশজনের যেমন নাম জিজ্ঞাসা করি না ওঁদেরও করিনি!

প্রায়ই আসতেন। জিজ্ঞাসা করতেন একটিই কথা, আমাদের কাজ-কর্ম চলবে তো ?

—কেন চলবে না। চলবে।

— যাঁরা কাজ করেন তাঁদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হবে তো ?

— নিশ্চয়ই।

সাধারণ আটপৌরে কথা। এর বেশি আর কিছু নয়। নিজের সম্পর্কে কখনও কিছু জিজ্ঞেস করেন না। ভাবতুম, ব্যবসা নিয়ে বোধহয় খুবই বিব্রত। সাধারণ ছোটোখাটো ব্যবসায়ীদের যা হয় আর কি!

কিন্তু আগুনকে কি ছাই চাপা দিয়ে রাখা যায় ? একদিন না একদিন প্রকাশ পায়ই। একদিন এক ভদ্রলোক ওঁরা চলে যাবার পর আমায় বললেন — ওঁর নাম জানেন ?

— না তো ! কেন ? ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালুম।

— বিরাট লোক।

— বিরাট !

— হ্যাঁ আমাদের সামাজিক মাপকাঠিতে নিশ্চয়ই তাই বলব।

— কি রকম বিরাট।

— ওঁর নাম··· । ······কোম্পানীতে কাজ করেন। বড় পোস্টে।

যে কোম্পানীর ভদ্রলোক নাম করলেন তার কখনও নামই শুনিনি আগে। আসলে ব্যবসায়ের জগৎ আমাদের কাছে অন্ধকার। বস্তুত আমরা হলাম আদার ব্যাপারী। জাহাজের খবর রাখবই বা কেন।

আস্তে আস্তে এখন জানতে শিখছি। ভারতবর্ষে বড় বড় কয়েকটি কনসাল্টেন্সি প্রতিষ্ঠান আছে। আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করে। এর মধ্যে যে কয়টিকে হাতে গণা যায়, যাদের পৃথিবীর সর্বত্র অফিস আছে— তেমনই এক প্রতিষ্ঠানের তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর র‍্যাঙ্কের লোক! ব্যাপারটা যখন বুঝলুম তখন সত্যিই অবাক হবার পালা। এহেন ব্যক্তির পদার্পণ গরীবের কুটীরে ! তাও তো ধরতে গেলে প্রায় নিষ্প্রয়োজনে। এটা ভাবতে কেমন অবাক লাগছে না ! যার কোন প্রয়োজন নেই তিনি এখানে আসবেন কেন ? লোকে আমার কাছে আসে যারা অধ্যাত্ম জগৎ সম্পর্কে কিছু জানতে চান, যোগ শিখতে চান। তবু যাঁরা ভাগ্য জানতে চান তাঁদের তুলনায় যোগ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। ওঁর

ভাগ্য জানার প্রয়োজন নেই, কারণ ভাগ্যের উপরই বসে আছেন। তাহলে তিনি আমার কাছে কেন? এ কথার জবাব বোধহয় উনিও জানেন না। প্রয়োজনটা ঈশ্বরের। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল আমি যখন অসুস্থ তখন। কলেজে আর ছুটি পাওয়া যাবে না। আমার দরদী অধ্যাপক বন্ধু শুভেন্দু বারিক এসে বললেন, যে করেই হোক কলেজে এসে জয়েন করুন। চাকুরিটা আগে রাখুন, তারপর দেখা যাবে।

তখন গ্রীষ্মের ছুটি পড়বে। পরীক্ষা চলছে। শুভেন্দু বলল, কোন রকমে হলে গিয়ে একটু বসুন। দিন পনের পরেই তো গ্রীষ্মের ছুটি। মাস দেড়েক ছুটি পাবেন।

প্রস্তাবটা তো ভালই, কিন্তু যাই কি করে? আমি তখন ভাল করে উঠে বসতেই পারি না। বাসে করে চলার স্বপ্ন তো দূর স্বপ্ন। চাকুরি তাহলে থাকবে না! মাস মাহিনাই যাদের একমাত্র সম্বল তাদের এক মাসের মাইনে কাটা গেলে অনাহার অনিবার্য। আমাদের সরকার আহার দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। আহার্য কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করেছেন আয়করের নামে। পরোক্ষ করের গাঁট কাটা ব্যবস্থাতে, মুহুর্মুহু সরকারী নীতি বদল করে। আজ বলবেন N. S. S. করলে N. S. S.-এর সব টাকাটাই আয়কর মুক্ত। জীবনধারা করলে যে-টাকাটা জমা দেবেন তাও আয়কর ছাড়। কাল বলবেন সবটা নয় ২০%। অদ্ভুত প্রতারণা করার কৌশল। সরকারের কথার খেলাপের জন্য আইন ভঙ্গ হয় না, পান থেকে চুন খসলে সাধারণ মানুষেরাই দায়ী। সরকার জানেন গরীব শিক্ষক একবার টাকা জমা দিয়ে পরের বৎসর আয়করমুক্ত না হলে আর জমা দিতে পারবেন না। পারলেও তাঁকে অর্ধাহারে থেকে তা করতে হবে। যদি না পারে এবং ফেরৎ চায় আয়করদাতাদের দেয় করের আরও বেশী আয়কর কেটে তাকে ছেড়ে দাও। ধন্য জনদরদী সরকার।

চাকুরি প্রায় ৩৬ বছর হয়ে গেছে। ভলাণ্টারি রিটায়ারমেণ্ট নিলেও পেনশন পাব। তবে পেনশনের প্রতিশ্রুতিটা কাগজে যত আছে কার্যত তা আছে কি? আমার গৃহিণী বছর তিনেক আগে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে

এখন হাত কামড়াচ্ছেন। D. I অফিস থেকে ফাইল নড়তেই গেল দু'বছর। বলে ঝামেলার কাজ। এমনি এমনিই কি ফাইল নড়ে! শেষ পর্যন্ত যদিও বা নড়ল এডুকেশন ডাইরেক্টরেট অফিসে অফিসারের সই করা ফাইল মুহূর্তেই গেল উধাও হয়ে। এই তো অবস্থা। সেখান থেকে ফিরে এলেও, সার্ভিস বুকে ভুল ধরা পড়ে ফেরৎ এল পি. এফ. অফিস থেকে। এখন আবার সেই ডি. আই অফিস। আদপে কোনদিন ব্যাপারটা মিটবে কিনা কে জানে!

এই যখন অবস্থা—তখন আমার চাকুরি গেলে? আমার অধ্যাপক কান্তিশ মাইতি বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। নামকরা বই আছে বাজারে। তিনি রিটায়ার করার ছয় বছর পরে পেনশন পেয়েছেন মাত্র আঠারশ টাকা। কান্তিশবাবুর বই থেকে রয়্যালটি প্রায় বাৎসরিক লাখ খানেক টাকা। পেনশন ছাড়াও বাজারের মাছ কেনা তাঁর আটকায়নি। আমার অধ্যাত্ম বিষয়ক বই বাজারে চললেও রয়্যালটির প্রশ্ন দেখা দিলেই পাবলিশাররা উধাও। ব্যতিক্রম একমাত্র দে'জ পাবলিশিংয়ের সুধাংশু দে। চুলচেরা হিসেব করে টাকা পাঠান। তাঁর ঘরে আমার এত বই নেই যে বাৎসরিক একটা থোক টাকা আসবে ঘরে। কান্তিশবাবুর মাছ কেনা না আট-কালেও আমার যে শাক কেনার পয়সাও হবে না এটা নিশ্চিত সত্য। তাহলে? তাহলে চাকুরি গেলে খাব কি? স্বাধীন ভারতবর্ষ আর যাই করুক জাতির নির্মাতা শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি। শুধু বলেছে—শিক্ষকতার বাইরে অন্য কোনো ভাবে আয় করতে পারবে না। বিমর্ষ মুখে আগত অনাহার-মৃত্যুর অন্ধকার ছায়া দেখছি। ঠিক তক্ষুণি আমার ঘরে ছিলেন সেই মেমসাহেব। সেই বিখ্যাত কনসালটান্টের সহধর্মিনী। বললেন, আপনি কলেজে জয়েন করুন প্রফেসর সরকার।

—কিন্তু যাব কি করে?

—সেজন্য ভাবতে হবে না।

—আমি যে ভাল করে বসতেই পারি না।

—মনে সাহস করুন। এভাবেই বাঁচতে হবে। আপনার ওই রোগ

আমারও হয়েছিল। আমি শুধু মনের জোরেই চলি।

শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, কবে যেতে হবে?

— যেদিনই উনি জয়েন করবেন।

কলেজের চাকুরিটা আমার আছে সেই মেমসাহেবের জন্যই। পনের দিনের জন্য তিনি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন—এক পয়সা খরচা নেই। চোখের জল রাখতে পারিনি আমি। এজন্যই কি ঈশ্বর ওঁদের পাঠিয়েছিলেন!

মাস দেড়েক গ্রীষ্মের ছুটি পেলাম বটে, আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের। কিন্তু এ এমনই রোগ রাতারাতি সুস্থ হবার সম্ভাবনা নেই। জেলখানার মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর মত বসে রইলুম প্রেসিডেন্টের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করে। সেই প্রাণ ভিক্ষা মিলতেও পারে নাও মিলতে পারে। এ যেন মৃত্যুযন্ত্রণারও অধিক। গ্রীষ্মের ছুটির পর কি চাকুরি রাখতে পারব?

আমরা আমাদের মত ভাবি বটে, আসলে কিন্তু ঈশ্বরমানস অনেক আগে থাকতেই সব কিছুর ছক কষে রাখেন। আমরা সেই ছকের কথা জানতে পারি না বলেই ভাবনা করি।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা মতই বুঝি এগিয়ে এলেন আর এক দাশগুপ্ত— শ্রীমতী অলকা দাশগুপ্ত। অলকা দাশগুপ্তকে আমরা অর্থাৎ আমি এবং আমার স্ত্রী বহুদিন আগে থাকতেই ডাকি অলকাদি বলে।

বিখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন লীডার স্বর্গত নারায়ণ দাশগুপ্তের পত্নী! স্বামী-স্ত্রী পরের জন্য অনেক ত্যাগ করেছেন। আজকালকার ট্রেড ইউনিয়ন লীডারদের মতন নয়, গাড়ি বাড়ি করবেন। প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়ই এক সময় থাকতেন মেটিয়াবুরুজে। গরীবের মা-বাপ ছিলেন। ওরা মা বাবা বলেই ডাকত।

বাস্তবে রাজনীতি করলেও কোথাও ফল্গুধারার মত একটা অধ্যাত্ম পিপাসা ছিল উভয়েরই হয়তো। শ্রীমতী দাশগুপ্তের জীবনে স্বামীর মৃত্যুর পর তাই অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। মৃত স্বামীর আত্মার নির্দেশ

তিনি বহুভাবেই পেতেন। একবার খুব মূল্যবান এক দলিল খুঁজে পাচ্ছেন না। কি করবেন ভাবছেন। এমন সময় দেখেন স্বামীর ছায়া-মূর্তি। একটি ছাতা স্বামীর সর্বদা সঙ্গী ছিল। সেই ছাতাটিও রয়েছে। সেই ছাতা দিয়ে তিনি একটি পুরনো বাক্সের দিকে ইঙ্গিত করছেন। প্রথমটা অলকাদি বুঝতে পারেন নি। পরে ভাবেন, হয়তো দলিলটি ওর মধ্যেই রয়েছে। বাক্স খুলতে সত্যিই দলিলটি পেয়ে যান।

সবার দৃষ্টিতে সূক্ষ্মাত্মার দর্শন হয় না occult faculty চাই। যাঁরা দেখেন তাঁদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম spiritualism থাকেই। শ্রীমতী দাশগুপ্তের মধ্যেও ছিল। সেটাই একদিন তাঁকে আমাদের খুব কাছে নিয়ে আসে।

পরের জন্য বেগার খেটে নিঃস্ব হয়ে এক সময় অলকাদিকে সামান্য একটি জুনিয়র হাই স্কুলে চাকুরি নিতে হয়। সেই সঙ্গে হাড়ভাঙা খাটুনির টিউশানি। উদ্দেশ্য নিজের ছেলে দুটিকে মানুষ করা। যে স্কুলে চাকুরি করতেন সেই স্কুলের মহিলা প্রোপ্রাইয়েটর মিসেস দত্ত শিক্ষা সংস্কৃতিতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না হয় তো। কিন্তু স্কুল খুলেছিলেন একটি। খুলে-ছিলেন নিজের বাড়িতে। অল্প দিনের মধ্যেই শ্রীমতী দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিরোধ। আপন শ্রমে স্কুলটিকে তখন অনেকটাই তৈরি করেছেন শ্রীমতী দাশগুপ্ত। তাঁর আদর্শের সঙ্গে মিসেস দত্তের স্বার্থের সংঘাত বেধে গেল খুব তাড়াতাড়ি। আমি তখন ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের পাশে বাড়ি করেছি। অলকাদির স্কুলটিও কাছেই। নাম ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমারী বালিকা বিদ্যালয়।

স্কুল নিয়ে সংঘাতটা এমন পর্যায়ে পৌঁছুল যে—স্কুলের সীমানার বাইরে চলে এল সেটা। মিসেস দত্ত যেমন করেই হোক আঞ্চলিক সমর্থনের অনেকটাই পেয়ে গেলেন। শ্রীমতী দাশগুপ্তের আদর্শের সঙ্গে আঞ্চলিক বামপন্থী আদর্শের তেমন মিল ছিল না। সেটাই হয়তো জনমত তাঁর বিরুদ্ধে চলে যাবার কারণ। কিন্তু যথার্থের পেছনে দাঁড়াবার লোকও আছে। শ্রীমতী দাশগুপ্তের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্থানীয় আরেক

ভদ্রলোকের দীর্ঘদিনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা এসে জুটল। তাঁর নাম বিনয় ঘোষ। লড়াই এসে স্কুলের প্রাঙ্গণ ছেড়ে ময়দানে দাঁড়াল। কোর্ট কাছারি হল। পুলিশের হস্তক্ষেপ হল। অসংস্কৃত মানসের কাছে যথার্থই হেনস্থা হলেন শ্রীমতী দাশগুপ্ত। কিন্তু নতি স্বীকার করলেন না। সেই সময় স্বর্গত বিনয় ঘোষ অর্থাৎ জনপ্রিয় বিনয়দা প্রায়ই আসতেন আমার কাছে। শেষে অলকাদির স্কুলের ব্যাপারটি এসেও পৌঁছুল। আমি রাজনীতি করি না বলে আমার হাতে শক্তি কই। কিন্তু কলম ছিল। অলকাদিদের যত বক্তব্য আমার কলমেই বেরুতে লাগল টাইপড হয়ে। শেষপর্যন্ত মহিলার সঙ্গেও পরিচয় হল। আমার গৃহিণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল বহু আগে থেকে। কারণ মেটিয়াবুরুজের নুটবিহারী গার্লস স্কুলের মর্নিং সেকশনে সেও কাজ করত।

শিক্ষকতার দিক থেকে সহধর্মিতা ছিল, আদর্শের দিক থেকে সহ-মর্মিতাও হল। কখন অজ্ঞাতেই সেই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়লুম আমরাও।

শেষপর্যন্ত অলকাদিরই জয় হল। স্কুল বাঁচল। সি. এম. ডি. এ. স্থানীয় একটি বাগান অধিগ্রহণ করে তার এক প্রান্তে স্কুলের বাড়ি তৈরি করে দিতে রাজি হলেন। আর এই সুযোগটি এসে গেল—পুরনো K. F. Railway-কে ডায়মণ্ডহারবার রোডের বাইপাশ হিসেবে তৈরি করার পরিকল্পনা গৃহীত হওয়াতে। পুরনো স্কুলবাড়ি তখন ভাঙা পড়ল।

স্কুলের জন্য নতুন জায়গার প্রয়োজন। সি. এম. ডি. এ. অধিগৃহীত জমির একটা প্রান্ত ছেড়ে দিল উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য। অবশ্য এজন্য শ্রীমতী দাশগুপ্ত ও ৺বিনয় ঘোষের অমানুষিক পরিশ্রম তো ছিলই।

প্রথম একটি জয়ের আনন্দ অনুভব করেছিলুম যখন স্কুল বাড়ির ভিত তৈরি হয়। ভিত খোঁড়ার দিন উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এম. এল. এ ইন্দ্রজিৎ মজুমদার। স্কুল তৈরি হবার সময় অবসর মুহূর্তেই আমি গিয়ে দেখেছি। যাতে দেয়াল দেয়া হয় সেজন্য কনট্রাক্টরকে বলেছি। ওঁরা বলেছেন সি. এম. ডি. এ-র অনুমতি নিতে। তখন হয়নি, আজ

হয়তো দেয়াল-টেয়াল সবই উঠেছে। শুনেছি সামনে একটা গেটও বসেছে। দীর্ঘ দশ বারো বছর পরে স্কুলের সংস্কারও হয়েছে। জুনিয়র হাই যথার্থ হাই স্কুলও হয়েছে। একে এ মর্যাদায় তুলে আনাই ছিল শ্রীমতী দাশগুপ্তের লক্ষ্য। সে লক্ষ্য আজ তাঁর পূর্ণ।

পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ—তখন আমি চলে আসি ঠাকুরপুকুর থেকে টালিগঞ্জে। অলকাদির স্কুলেরই এক শিক্ষিকা শ্রীমতা নন্দা মুখার্জী। আগে থাকতেন ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক কলোনীতে। আমাদের আগেই বাড়ি বিক্রী করে চলে আসেন টালিগঞ্জ ব্রীজের ওপারে বড় রাস্তার ধারে একটি বাড়িতে। ঠাকুরপুকুর থাকতেই পরিচয় ছিল। এখানেও কাছাকাছি। বিধাতার বোধহয় কিছু কিছু পরিকল্পনাই থাকে এই ধরনের।

ওঁর মাধ্যমে একবার অলকাদি খবর পাঠান আমাকে, তিনি কেদার-বদ্রী যাচ্ছেন। জানালুম যান। তবে ধ্বসে পড়বেন। কিন্তু ভয় নেই। সত্যি সত্যিই তাই। ফেরার পথে ধ্বসেই পড়লেন। কিন্তু ঈশ্বর রাখলে মারে কে! নিরাপদেই ফিরে এলেন।

কী ছিল তাঁর মনে কে জানে। একদিন এসে দেখা করে বললেন, 'যোগ শিখব'। শিখলেনও। এখন যোগ শিখে অনেক রকম দিব্য-দর্শিনী। ইতিমধ্যে ছেলেরা দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। যে অলকাদি জীবিকার সন্ধানে ঠাকুরপুকুর গিয়েছিলেন দুটো ছেলেকে মানুষ করবেন বলে—সেই অলকাদিই আজ গাড়ি করে স্কুলে যান। গাড়ির পেট্রোল খরচার টাকা মাইনে পান কিনা জানি না। তবে স্কুলের যত ছাপার কাজ তা হয় বিনে পয়সায় তাঁর ছেলেদেরই প্রেস থেকে। যত জেরোক্স তাও তাঁরই কল্যাণে বিনে পয়সায়।

মাসে মাসে আসেন। আমার ভয়ানক অসুখে চোখে যখন অন্ধকার দেখছি, আমার প্রকাশকেরা এসে খোঁজ নেন না। আত্মীয় স্বজনও নয়। অলকাদি আমার গৃহিণীকে বললেন, চিকিৎসার জন্য চিন্তা কোর না। টাকার প্রয়োজন হলেই বলবে। মানুষ কত বিচিত্র রকমের হয় ভাবছি। যাদের

কাছে পাই তারা এড়িয়ে বেড়ায়। যাদের কাছে পাওনার কোন কিছুই নেই তাঁরা এসে অযাচিতভাবে হাত উপুড় করেন। ঈশ্বরের নাটক যে এত বিচিত্র কেন!

চিকিৎসার জন্য টাকার কোন প্রয়োজন হয়নি। যদিও এখনও আমি তেমন সুস্থ নই। কিন্তু সুস্থ হই না হই বাঁচার তাগিদে কলেজে যোগদান করতেই হবে। প্রশ্ন শুধু এই যে, কলেজে যাব কি করে? বাসে ওঠার ক্ষমতা তো আমার নেই! তবে? ভেবে ভেবে যখন অন্ধকার দেখছি, বিমর্ষ হয়ে আছি, চাকুরি থাকবে না, হঠাৎ আবার একদিন অলকাদি এসে জিজ্ঞেস করলেন, কলেজে যাবেন কি করে? বাসে তো চাপতে পারবেন না।

—'জানি না।' আর্ত চোখে আমি তাকালুম।

—একটা গাড়ি কিনে নিন।

—গাড়ি! খেতে পাই না গাড়ি!

—গাড়ির দাম করুন। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড।

—পাগল নাকি। দাম করে করব কি?

—করুন না, টাকার জন্য ভাববেন না।

অবশেষে আমার খুব নিকট ব্যক্তি খিদিরপুরের রাজেন রায়। আমার অসুস্থতার সময় আমায় তিনি নিত্য দেখেছেন। তাঁর উপস্থিতি ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতই আমার কাছে। তিনি আমাকে তার এক বন্ধুর গাড়ির খবর দিলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল গাড়িটা ভালই। দামও ঠিক হল। অলকাদি নির্দিষ্ট অঙ্কের একটা টাকা দিয়ে গেলেন কথামত। জিজ্ঞেস করলুম, ঋণ কতকাল বইব?

— যখন সুযোগ আসবে ফেরৎ দেবেন।

—যদি না পারি?

—দেবেন না।

আমাদের এক স্নেহভাজন প্রদীপ দত্ত। বাবা বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ভাগ্য দুর্বিপাকে সর্বহারা হয়ে, সব খুইয়ে আবার সে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সম্পর্ক এত নিকট যে, আমার গৃহিণীকে ডাকে পিসি বলে। আমাকে পিসেমশাই। বললে, আরো যদি টাকার প্রয়োজন হয় আমি দেব। গাড়ি কিনুন। আপনার কাজ হলে গাড়িটা আমিই নেব। ঋণের টাকা মিটিয়ে দেবেন। সত্যি! বিধাতার বিচিত্র মানসিকতার খবর পাওয়া ভার!

গাড়িটা কিন্তু টাকা অ্যাডভান্স করেও হয়নি। মালিকানা কার তাই নিয়ে প্রশ্ন। তাহলে! তাহলে কি আমার কলেজে যাওয়া হবে না? অলকাদি বললেন, নতুন গাড়ি দেখুন।

নতুন গাড়ি দেখব। হঠাৎ গড়িয়ার একটি ছেলে, দিলীপ চক্রবর্তী এসে বলল, একটি গাড়ির সন্ধান আছে। ব্যবসায়ী মহলের গাড়ি। গাড়ির কণ্ডিশন ভাল। নেবেন?

পাগলাটে ধরনের দিলীপের কথাও কোনদিনই ভোলার নয়। অসুস্থতার দিনে পাশে এসে দাঁড়াল যেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মত। আজও সে পাশেই আছে। ও যখন বলল—গাড়ি নেবেন? বললুম,—নিশ্চয়ই। অবশ্য দামে বনলে।

—দামে বনবে। আপনারই খুব পরিচিত ব্যক্তি।

—আমার!

—হ্যাঁ।

—আপনি অসুস্থ হবার কয়েকদিন আগেই নিয়ে এসেছিলুম। কি বলে দিয়েছিলেন জানি না। তাঁর ভাগ্য ফিরে গেছে। দুঃসময় কাটিয়ে উঠেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করবার কয়েকবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দেখা হয়নি। খবর দেব?

—দাও।

কার কথা দিলীপ বলছে বুঝতে পারলুম। সৌম্যদর্শন এক ব্যবসায়ী, নাম বলবীর প্রসাদ গুপ্তা। সারা ভারতব্যাপী ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবসা। কী গভীর বিশ্বাস বলবীর প্রসাদ গুপ্তার! তাঁর ধারণা বিপদের দিনে আমার কাছে এসেই তাঁর বিপদমুক্তি ঘটেছে। একথা ঠিক যে, তাঁর জন্য

সামান্য একটু কাজ করে দিয়েছিলুম। এ কাজ যাদের জন্য করা হয় তাদের অনেক বিপদই কেটে যায়। তবে সচরাচর এ কাজ করিই নে। কেন যে করেছিলুম জানি না। হয়তো অদৃশ্যে এটাই ছিল বিধাতার পরিকল্পনা। নইলে এমন হবে কেন?

বলবীরবাবু এসে বললেন, গাড়ি আছে ভাল কণ্ডিশনের গাড়ি। জিজ্ঞেস করলেন, কত দিতে পারব। লোকে যে অঙ্কের টাকার গাড়ি কেনার জন্য আমাকে দিয়েছিল সেই অঙ্কের কথাই জানালুম। উনি বললেন– তাই হবে।

গাড়ি বলবীরবাবু ধরে রাখলেন বটে কিন্তু গাড়ি পাওয়া যায় না। কারণ যিনি গাড়ি বিক্রী করবেন তিনি নতুন গাড়ি বুক করেছেন। কিন্তু কবে নতুন গাড়ি দেওয়া হবে জানতে পারছেন না। এখানেও আছে ঘুষের ব্যাপার। ক্রেতাকে জানানো হয়েছে হাজার চব্বিশেক টাকা দিলে গাড়ি আসবে তাড়াতাড়ি। হায়রে ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর আর কিছু অর্জন করুক না করুক একটি জিনিস নিশ্চয়ই আয়ত্ত করেছে যাকে বলে নিরঙ্কুশ দুর্নীতি!

গাড়ি যদি না পাওয়া যায় তাহলে কলেজে যাব কি করে! ভেঙে পড়ার উপক্রম। বলবীরবাবু বললেন, চিন্তা করবেন না। কলেজে যাবার ব্যবস্থা হবে।

— 'কি করে?' আমার চোখে কোন বিশ্বাসের দৃষ্টি নেই! না থাকার কারণ, ধর্মের কথা আমরা যতই বলি না কেন ঈশ্বরে নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণ করতে তো পারি নি!

দেখলুম, কিছু কিছু লোক আছেন যাদের বিশ্বাসের পরিধি আমাদের পরিমাপের বাইরে। আমি যোগ শিখেছি এক হিমালয়ের সাধুর কল্যাণে। বলবীরবাবু আমায় বিশ্বাস করতে শেখালেন যে, বিশ্বাসের মধ্যে কোন রকম ভেজাল থাকতে নেই।

কারো বা বিশ্বাস ভেতর থেকে জন্মায় জন্ম জন্মান্তরে অর্জিত ভাবনার ফলে। তার সঙ্গে থাকে মহাপ্রাচীন পিতৃপুরুষ থেকে বয়ে আসা ঐতিহ্য।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে বিশেষ জাতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য অদ্ভুত এক মানসিকতা। প্রচলিত সব কিছুকেই চ্যালেঞ্জ করার মনোভাব। সেই জন্য ভারতের পূর্বপ্রান্ত থেকেই দুই মহাপুরুষ প্রচলিত বৈদিক সমাজ ও ধর্ম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম তৈরি করেছিলেন। বাংলার মাটিতে প্রতিবাদের মানসিকতা এত বেশি যে, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সবকিছু প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই সে বিদ্রোহ করেছে বার বার। সেই জন্য মুসলিম আমলে তিতিবিরক্ত দিল্লী বাংলার রাজধানী গৌড়ের নাম দিয়েছিল 'বলঘাঘপুর' অর্থাৎ বিদ্রোহের নগরী। বাংলার মাটি নাকি বড় বিচার চায়। চৈতন্য-দেবের মত মহা ভক্তকে বিচারের সূত্র ধরেই আসরে অবতীর্ণ হতে হয়ে-ছিল। নৈয়ায়িকদের পরাজিত করতে না পারলে কৃষ্ণ নামের মহাপ্রেম তিনি এদেশে প্রচার করতে পারতেন না। নির্ভেজাল ভক্তিসূত্র বুঝি একমাত্র সাধক কবি রামপ্রসাদই প্রচার করতে পেরেছিলেন—তাও সুযোগ পেলেই মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিয়ান মিশিয়ে। এ বড় ত্যাঁদড় জাত, সহজে কোন কিছু নিতে চায় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব মূর্খ হলে কি হবে, মা মা বলে পাগল হলে কি হবে, তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজকে তর্কেই হারিয়েছিলেন। তাঁর উপমা উৎপ্রেক্ষা এমন যে, তাঁর কাছে তার্কিকের তর্কও দাঁড়াতে পারে না। 'রামকৃষ্ণ কথামৃতে'র মত এমন করে বুঝিয়ে ঈশ্বর-কথা বলার গ্রন্থ কই? গল্পের মধ্যে এমন করে বেদান্তের কথা আর কে বলতে পেরেছেন! স্বামী বিবেকানন্দও তো লজিককেই নির্ভর করেছিলেন। আবার এ দেশেই (বঙ্গদেশে) বস্তুবাদী ভাঁড়েরা আছে যাঁরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মত দিব্যপুরুষকেও যৌনবাসনা-রুদ্ধকারী উন্মাদ বলে উল্লেখ করেছেন। ইদানিংও কোন স্বঘোষিত বুদ্ধি-জীবী কালীকে 'মাগী' বলে, 'প্রতিমা' পূজাকে 'পুতুল পূজা' বলে। সগর্বে শুধু হিন্দুধর্মকেই আঘাত করতে পারে। অপর ধর্ম সম্পর্কে কথা বলতে ভয় পায়। কারণ, ভুঁড়ি ফেঁসে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয়। আপামর বাঙ্গালীও মনেপ্রাণে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন কিনা জানি না।

হয়তো 'একটু বাজিয়ে নিয়ে করব' বলে উদ্দেশ্য হাসিল করে সাধুসন্তের কাছ থেকে সরে পড়ে। চালাকীর দ্বারা মহৎকার্য হয় না। তার প্রমাণ স্বাধীনতার কালে জাতীয় তালিকার প্রথম প্রদেশ থেকে বাংলার স্থান আজ সর্বশেষে। বুদ্ধির প্রখর জাল বিস্তার করে একটাই কাজ করেছি যাকে বলে 'work culture', সমূলে তাকে ছাগলে মুড়ে খাবার মত খেয়ে নিয়েছি। নিজের ঘরেই আজ আমরা দাস। দাস তাদেরই কাছে যাদের বিশ্বাস আছে।

মধ্যভারতেই বিশ্বাস বেশি। ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ বেশি। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন বজরঙবলী তার 'রাম বিশ্বাসে' সেই আদর্শকেই আজ হিন্দীবলয়ে তর্কাতীত বিশ্বাসের উপর স্থাপন করেছেন। 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এত বড় দর্শন ব্যক্ত করেও 'সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্যং মামেকং শরেণং ব্রজ' বলে যে বাণী উচ্চারণ করেছেন, হিন্দী-ভারত বিনা প্রতিবাদে তাকে মেনে নিয়েছে। এখনও ভারতবর্ষের উপর ওদেরই প্রাধান্য।

দক্ষিণ ভারতীয় বিশ্বাসের মধ্যে আছে আচার-ভিত্তিকতা। এটা ওদের কি দিয়েছে জানি না। তবে দই তেঁতুলে যে ওদের মস্তিষ্কস্নায়ু দুর্বল হয়নি—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখার সুযোগ তারা দেয়নি। ভারতবর্ষের বুরোক্র্যাসি আজ ওদেরই করায়ত্ত।

বলবীরবাবুর বিশ্বাস হয়তো তার পরিবেশ জাত। কিন্তু মজার কথা এই যে, সে বিশ্বাসে চির নেই। আজ অনেক ভারতবাসীই আমেরিকার প্রতি মানসিক দাসত্বে নাকে খৎ দিয়ে আছে। আমেরিকা ঘুরে না এলে সমাজে কোন status নেই। অথচ সেই আমেরিকান লেখিকা Betty J. Eadie 'Embraced by the Light' গ্রন্থেই লিখেছেন যে, দক্ষিণ আমেরিকায় বহু শহরে সাইনবোর্ডে লেখা থাকে—No Indians or dogs allowed. অথচ বলবীরবাবুদের মত লোক আজও আছেন, যাঁরা পশ্চিমী দেশগুলোকেই তাঁদের একমাত্র আদর্শ করেননি।

বলবীরবাবু বললেন, যতদিন গাড়ি না আসবে—আমার গাড়ি

আপনাকে কলেজে নিয়ে যাবে, নিয়ে আসবে। খরচের অঙ্কটা অল্প নয়। গত জুলাই মাস থেকে বলবীরবাবুর গাড়িতেই কলেজে যাচ্ছি, আসছি।

ভাবতে গেলেই চোখে জল আসে। মানুষ নিশ্চয়ই তাঁর বিচার বুদ্ধিতে কাজ করে। তার বিচার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করার মত স্পর্ধা আমার নেই। তবু ঘটনা আমার ক্ষেত্রে যে ভাবে ঘটছে—তাতে মনে হয় পূর্বাহ্ণেই কেউ যেন অদ্ভুত রকমের একটা ছক কষে রেখেছিল। কিংবা এক সর্বব্যাপী মহামানস আছে—আমরা যার অংশ। সেই মহামানসেরই ইচ্ছা আমাদের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়। কখনও কখনও ক্ষুদ্রের সীমানা এই মহামানসের উজ্জীবন প্রয়াসেই লুপ্ত হয়ে যায়। মানুষ নিজের ইচ্ছার স্বরূপ নিজেই বুঝতে পারে। নিজের অভ্যন্তরে ডুব দিতে গিয়ে দেখে যে সেখানে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সীমানা শেষ হয়ে অনন্ত বিশ্বের চিত্র উঁকি দিচ্ছে। এই সর্বব্যাপ্তিই হল অন্তরতম—পরমাত্মা। যে 'পরমাত্মা সমুদ্রে' বুদ্‌বুদের মত ব্যক্তি-জীবন। অন্তরের অন্তস্তলে সব-ই নাকি য়ুঙের unconscious. জানি না কে এমন করে বিপদের দিনে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—ব্যক্তি মানুষ না পরমাত্মা স্বয়ং! মনে হচ্ছে পরমাত্মার উজ্জ্বল চোখ এখন আমি দেখতে পাচ্ছি।

যোগ যখন আরম্ভ করেছিলুম কয়েক তখন দিনের মধ্যেই দেশে (space) অদ্ভুত একটি চোখ দেখে চমকে উঠেছিলুম। জীবন্ত টলটলে চোখ। মহামায়ার চোখ যে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আজ বুঝতে পারছি সেই-ই হল মহাবৈশ্বিক জাগ্রত চেতনার চোখ—cosmic eye. সে চোখের ভাষা সেদিন বুঝতে পারিনি। বিস্ময় বোধ করেছিলুম। আজ বুঝি, এই হল পরমাত্মার চোখ। যতক্ষণ না তাঁর আত্মজ ক্ষুদ্র প্রাণী বিশ্বে স্বয়ংনির্ভর হচ্ছে ততক্ষণ সেই জাগ্রত চোখে পলক নেই, মহারণ্যে ভয়ানক সদ্যপ্রসবা ব্যাঘ্রীর মত। শিশুরা জানে না মায়ের সদাজাগ্রত চোখ তাদের আগলে আগলে রাখছে। যেই তারা স্বাবলম্বী হল মায়ের চোখ ফিরে গেল। বাঘিনী চলে গেল আপন পথে। পরমাত্মার চোখ অন্ধ সন্তানের জন্য কখনই বন্ধ হয় না। যে সন্তানের সত্যদৃষ্টি ফুটেছে সে

স্বাবলম্বী বাঘিনীর শাবকের মত। তখন তার আপন চোখের জ্যোতিতেই সে ভাস্বর। যখনই কেউ পরমাত্মার লীলা বোঝে তখনই সে স্বাবলম্বী। তখন সে সুখে বিহ্বল হয় না, দুঃখে অভিভূত হয় না। দুঃখ সুখের এই হৃদস্পন্দনে পরমাত্মার বিচিত্র লীলা বুঝতে পারে। তখন মহাবিশ্বসংসারে পরম চেতনার বুকে তার অবাধ বিচরণ, যেন জলের বুকে জলের ঢেউয়ের নৃত্য।

মনে পড়ছে ডঃ মাজিল্যার কথা। অমন ভাল মানুষ কখনও তো দেখিনি। অত গুণী অথচ অত নিরভিমান। বুঝবার উপায় নেই একজন M. D. ডাক্তার। মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক। চন্দের একমাত্র পুত্র-সন্তান যখন ইহলোকে নেই—সাতদিন ভরে তাঁর ঘরে বোধহয় ঠায় বসে ছিলেন মাজিল্যা। চন্দেরই অনুরোধক্রমে বোধহয় এসেছিলেন আমাকে চিকিৎসা করতে। কারণ আমার যে রোগ বাহ্যত ধরা পড়েছে তারই তিনি চিকিৎসক।

কী সন্তর্পণী ডাক্তার! কী নিষ্ঠা! ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল সময়ের বুক ধরে চিকিৎসা করে গেলেন এক পয়সা না নিয়ে। ডাক্তারের আকালের দিনে এমন একদল চিকিৎসক-রত্ন আমার কাছে আনলেন কে? আর এমন চিকিৎসকই সব এলেন, যাঁদের আদর্শ অর্থ নয়—পরমার্থ; যাঁদের লক্ষ্য স্বার্থ নয় পরার্থ!

কিছুতেই ভুলতে পারি না—টালা পার্ক অঞ্চলের ইন্দ্রলোক হাউসিং এস্টেটের মহাদেব ভট্টাচার্য ও কণিকা ভট্টাচার্যের কথা। যোগ শিখে-ছিলেন আমার কাছে। এখন ওঁরা নিশ্চয়ই যোগে অনেককেই ছাড়িয়ে গেছেন। আমার অসুখের খবর পেয়ে মহাদেব এসে যেচে টাকা দিয়ে গেল—অথচ ওরই তখন টাকার দরকার। যে প্রকাশকেরা নিষ্ঠুর কষাইয়ের মত ব্যবহার করল—তারই পাশে এমন মানুষও তো আছে! টাকা পাছে শোধ দেই সেই ভয়ে বোধহয় কাছেই আসছে না এখনও।

এ সবই হয়তো পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা। আমাদের মত অন্ধজনের চোখ খুলে দিতে, বুঝিয়ে দিতে যে, আমরা বৃথাই ভাবি, আমাদের জন্য ভাবার

কোন মহামানস আছে। আমাদের যা প্রয়োজন তা সেই মহান ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করা। আমাদের দৃষ্টির অজ্ঞাতে কতভাবে যে তাঁর সেই চিরন্তনী পিতার দৃষ্টি মায়ের স্নেহের মত কাজ করে যাচ্ছে, বুদ্‌বুদের ক্ষুদ্রতাকে যারা সত্য বলে মানি তারা সেটা বুঝতে পারি কই ? পরমাত্মার চোখ চিরজাগ্রত। যে-চোখ যোগে দেখেছি সেই রহস্যময় চোখের হয়তো আরো কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু তা বুঝতে পারে কজনে ?

এখন আর আমার যৌগিক জ্ঞানে পরিতৃপ্তি নেই। মহা এক জাগ্রত মানসের প্রতি আত্মসমর্পণের ইচ্ছাটাই প্রবল। তাঁরই উপর বিশ্বাস করে বসে থাকতে হবে। কোন কিছুই তাঁর অগোচরে কখনই ঘটে না। ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন।

এই যে চিরজাগ্রত মানসের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ—একেই কি বলে ভক্তি ? বোধহয় বিশ্বাসের অভাবের কারণে যোগ করে অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে নেবার জন্যই সেই পরম মানস আমাকে দিয়ে যোগ করিয়ে নিয়েছিলেন। আশ্চর্য ! এতদিন এই ভক্তি সম্পর্কে কোন অনুসন্ধানই করিনি। এবার মনে হচ্ছে সেই অরূপের চরণ ছাড়া নির্ভর করার আর কিছুই নেই।

অবশেষে ভক্তির উপরই নজর গেছে। ভক্তি ব্যাপারটা জানতে চাই। কেন মানুষ ভক্তির পথ নিয়েছিল? কবে নিয়েছিল? ভক্তির পেছনে তাদের তত্ত্বই বা কি? পুঁথি খুলে বসলুম।

ভারতবর্ষে যাঁরা কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গকেই মোক্ষ লাভের পথে বিশেষ মূল্য দেন—তাঁরাই 'ভক্ত' নামে পরিচিত, ভক্তি-মার্গের পথিক বলে চিহ্নিত। মূলত বৈষ্ণবদেরই ভক্তিমার্গের পথিক বলা হয়। তবে বর্তমানে আরাধ্য দেবতা হিসেবে যাঁরা শিব, শক্তি ও গণেশকে পূজা করেন উদ্দিষ্টা দেবতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন, তাঁরাও সবাই ভক্ত। মীরা ভক্ত, শ্রীচৈতন্যও ভক্ত। আবার সেই অর্থে রামপ্রসাদ সেন বা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্ত। আমি ভক্ত তুমি ভগবান—আমি তোমার পূজা করব—এমন ভাবই ভক্তির ভাব। ভক্তির সঙ্গে যুক্ত আছে দুটি শব্দ— ভগবত্ ও ভাগবত্। সংস্কৃত শব্দ 'ভজ' অর্থাৎ ভজনা করা থেকেই ভক্তি শব্দের উৎপত্তি। ভগবত্ শব্দের অর্থ উপাস্য, ভাগবত্ শব্দের অর্থ উপাসক। ভক্তিকে বলে অনু-রক্তিও, জ্ঞানের পর (অনু) যে রক্তি (আসক্তি) জন্মে তারই নাম অনুরক্তি। শাণ্ডিল্যের মতে 'ভক্তিই যে জ্ঞান তা নয়। কিন্তু জ্ঞানের পরই ভক্তি আসে। ভক্তি যে কোন পদ্ধতির দিকে ভক্তি তা নয়, ভক্তি হল বিশেষের প্রতি ভক্তি—যাঁকে ভক্তি করলে অমরত্ব অর্জন করা যায়। অবশ্যই এই অমরত্ব মানে এই নয় যে, স্থূল দেহের মৃত্যু হবে না। আসলে ভক্তের আত্মিক মৃত্যু ঘটবে না। এই ভক্তি যে কর্মফল অনুযায়ী হয় তা নয়। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অর্জন করা যায় তাও নয়। কর্মফলও ক্ষয়ে যায়, কিন্তু ভক্তি দ্বারা অর্জিত ফলের কখনও ক্ষয় নেই। ভক্তকে বলতে হবে, আমার স্বেচ্ছাকৃত কর্ম, অনিচ্ছাকৃত কর্ম সবই আমি তোমার পায়ে সমর্পণ

করছি। কর্মফল দ্বারা অর্জিত যে লাভ তা ভবিষ্যতে বন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু ভক্তির লাভ মোক্ষের লাভ।

ভক্তি এক দিকে বিশ্বাস। তবে তথাকথিত বিশ্বাস নয়, যাকে বলা যায় আস্থা। এ বিশ্বাস প্রহ্লাদের বিশ্বাস, যিশুখ্রীস্টের বিশ্বাস।

আসলে বিশ্বাসও হল ভক্তির পথে একটি ধাপ মাত্র। তাই বলে ভক্তি দ্বারা বিশ্বাস জন্মায় একথা ঠিক নয়। অনেক সময় দেখা যায় জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি হয়। কিন্তু তাই বলে ভক্তি দ্বারা জ্ঞান হয়—একথা সত্য নয়। ভক্তি হল শেষ কথা।

ভক্তির মূল্য যে যথার্থ একথা পরীক্ষামূলকভাবে স্বীকৃত। যাঁর ভক্তি জন্মেছে উপাস্যের প্রতি তাঁর থাকবে অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা, নিজের পাপের জন্য পরিতাপ। একমাত্র উপাস্য ব্যতীত আর সবকিছুর প্রতিই সন্দেহ। উপাস্যের ইচ্ছার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। দুষ্ট চিন্তা, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা সব কিছুই পরিত্যাগ।

ঈশ্বরে ভক্তি যে তার সর্বোচ্চ অস্তিত্বের প্রতিই হতে হবে তা নয়। তাঁর অবতারের প্রতিও এ ভক্তি যেতে পারে—যেমন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রমুখ। ঈশ্বর করুণাবশতই অরূপ থেকে রূপ ধরে অবতার রূপে আবির্ভূত হন। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কারও মধ্যে এই করুণা নিঃশর্ত করুণা রূপে দেখা দেয় না। নিঃস্বার্থভাবে অপরের দুঃখমোচনের জন্যই ঈশ্বর যুগে যুগে ধরায় অবতার রূপে অবতীর্ণ হন। ইংরেজিতে বোধ হয় Faith, Belief, Devotion ইত্যাদি কোন শব্দেই যাকে বলে ভক্তি তা বোঝায় না। Faith, Belief এসবই ভক্তি অর্জনের ধাপ মাত্র। আর Devotion আসে বিশ্বাস জন্মাবার পর।

ভারতীয় আধ্যাত্ম শাস্ত্রগ্রন্থেও 'ভক্তি' শব্দটির আমদানি অনেক পরের। এই ভক্তির জন্য চাই বিশেষ। কিন্তু বৈদিক চিন্তা বিশেষ করে ঔপনিষদিক চিন্তা দীর্ঘদিন ভারতীয়দের নির্বিশেষ সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছিল। তাই ঈশ্বর রূপ ধরে ভারতীয়দের কাছে আসতে পারেননি বহুদিন।

'দেবতার প্রতি অনুরাগ' এ ধরনের কথা—খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধ গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া যায়। একই অর্থে পাণিনির সংস্কৃত ব্যাকরণেও শব্দটির উল্লেখ নজরে পড়ে। শ্রীমদ্ভগবতগীতার প্রাচীন অংশে শব্দটি প্রথম স্বীকৃত সত্য হিসাবে দেখা দেয়। এরপর নানাধরনের সংস্কৃত সাহিত্যেই 'ভক্তি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় বারবার।

ভক্তির ঈশ্বর শুধুমাত্র ব্যাক্তির ঈশ্বর নন, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর। তবে ভক্তির সূত্র অতি প্রাচীন ভারতেও যে খুঁজে পাওয়া যায় না তা নয়। ঋগ্বৈদিক বরুণ সূক্তে দেবতার যে ভাবে উল্লেখ পাই তাতে ভক্তির রস যে একটু মাখানো নেই তা নয়। তবে সুর এখানে বড় ক্ষীণ। একেশ্বর-বাদীয় ভক্তির দিকে না গিয়ে ভারতীয় সাধারণ মানস তখনও বহুদৈবিক উপাসনাতেই ব্যস্ত ছিল। একেশ্বরবাদীয় বা দ্বিতীয়হীন ব্রহ্মন বা পরব্রহ্মনের কল্পনা বুঝি শুধু উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমিত ছিল। ধীরে ধীরে তাঁরা জনগণদুয়ারে সেই অত্যুচ্চ আদর্শের চিন্তাকে নামিয়ে আনেন। তবে একেশ্বরবাদীয় যে ধারণা তা বোধ হয় উত্তর ভারতের প্রান্তে জন্মগ্রহণ করেনি।

আর্যরা বহিরাগত এ ধারণা অধিকাংশ চিত্তে আজও স্থানলাভ করে থাকলেও বর্তমানে দেখা যাচ্ছে অনেকেই অকাট্য প্রমাণ নিয়ে বলছেন যে আর্যরা বহিরাগত নয় এদেশেরই আদি অধিবাসী। বরং এদেশ থেকেই বাইরে গিয়েছিলেন। David Frawlay তাঁর 'The God, Sages and Kings' গ্রন্থে বক্তব্যটি এত জোর দিয়ে রেখেছেন, এমন প্রমাণ বা সাক্ষ্যসাবুদ সংগ্রহ ও উত্থাপন করেছেন যে, সন্দেহ করার বিন্দুমাত্র অবকাশই যেন আর নেই। সে যাই হোক, আর্যরা যাঁরাই হোন না কেন, ভারতের সিন্ধুনদ অঞ্চলে অর্থাৎ সপ্তসিন্ধুতে অতি প্রাচীন কালে আমরা যে আর্যদের সন্ধান পাই পরবর্তীকালে ভারতের অভ্য-ন্তরের আর্যদের সঙ্গে তাদের চিন্তাভাবনার বেশ একটা পার্থক্য ছিলই। ভারতের মধ্যদেশে অর্থাৎ দিল্লী ও তার সন্নিকটবর্তী উত্তরের অঞ্চলে পরবর্তীকালে উল্লেখিত আর্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য ছিলেন

কুরু গোষ্ঠি। এই মধ্যদেশে প্রচলিত ভাষাই পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বৈদিক সূক্তগুলি প্রধানত বোধহয় এই মধ্য-দেশেই সংগৃহীত। এখানেই ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য প্রথম প্রতিষ্ঠিত। আজও সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে, অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে কম বেশী সেই প্রাধান্যই চলছে।

মধ্যদেশে সে আর্যরা থাকতেন তাদের চতুর্দিকে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমেও আর্যরা ছিলেন। তবে মধ্যদেশের আর্য সমাজ যেভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের মধ্যে পড়েছিলেন সীমান্ত দেশের আর্যরা সে ভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের অধীনস্ত হননি। এখানে বরং ক্ষত্রিয়েরাই যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করতেন। সে চিন্তাভাবনার কথা মধ্যদেশের ব্রাহ্মণেরাও উল্লেখ করে গেছেন। এই সীমান্ত ভারতীয় আর্যরাই সাংখ্যা দর্শনের মত দর্শন সৃষ্টি করেছিলেন। এই পূর্ব-প্রান্তদেশেই মহাবীর ও শাক্যসিংহের মত ক্ষত্রিয়রা দুটো বিদ্রোহী হিন্দুধর্ম তৈরি করেছিলেন—জৈন ও বৌদ্ধধর্ম। এখানেই মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণেরা যখন 'মহাবৈশ্বিক ঋত্ এবং রীতি ও ঈশ্বর এক' এমন মতবাদের অর্থাৎ সর্বেশ্বরবাদের উদ্ভব ঘটাচ্ছিলেন পূর্বদেশীয় ক্ষত্রিয়েরা তখনই অদ্বৈত সত্তা সম্পর্কিত চিন্তার সূত্রপাত করছিলেন।

শাক্যমুনি ও মহাবীরই যে পূর্বদেশীয় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শুধুমাত্র দু'জন চিন্তাবিদ ছিলেন, তা নয়। মিথিলার রাজর্ষি জনকের মত চিন্তাবিদও ছিলেন, ভাগবতধর্ম উদ্ভবের সঙ্গে যাঁর যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড়। সম-কালীন ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে নানা অধ্যাত্ম ও দার্শনিক বিষয়ে তিনি আলোচনা করতেন। ভাগবত পুরাণের[১] সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা কপিলের মত দার্শনিক এসেছিলেন কোন রাজর্ষির বংশ থেকেই। সুতরাং অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, কপিল ছিলেন ক্ষত্রিয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও কৌশিতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে আছে, গার্গ্য নামে এক ব্রাহ্মণ কাশীতে অজাতশত্রু নামে এক ক্ষত্রিয়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

মধ্যদেশের পূর্ব ও দক্ষিণে রয়েছে পঞ্চাল দেশ। এখানে বড় বেদাবিদ ছিলেন ক্ষত্রিয় জৈবলি। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে তর্কে তিনি

১. ভাগবত পুরাণ—৩. ২১. ২৬

ব্রাহ্মণদেরও পরাজিত করেছিলেন। ব্রাহ্মণ গৌতম তাঁকে গুরু হিসেবেও বরণ করেছিলেন। জৈবলির মতে তাঁর অধ্যাত্ম বিষয় শুধুমাত্র ক্ষত্রিয়দেরই বিষয়। ছান্দোগ্য উপনিষদেই দেখা যায় যে পশ্চিম পাঞ্জাবের কৈকেয় দেশ থেকে পাঁচজন ধর্মতত্ত্ববিদ মধ্যভারতের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলেন, যে প্রশ্নের জবাব সেই ব্রাহ্মণ দিতে পারেন নি। সেই ব্রাহ্মণ তখন অশ্বপতি নামে এক ক্ষত্রিয় রাজার কাছে প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য তাঁদের পাঠিয়েছিলেন। অশ্বপতি সত্যিই তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যায় সেকালে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের কাছে জ্ঞান সংগ্রহেও দ্বিধাবোধ করতেন না। আবার সুযোগ পেলে তাদের নিন্দেও করতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়দের চিন্তাধারাকে বিদ্রূপ করার প্রবণতাও রয়েছে।[১]

তবে কি ভাবে কোন্ বিচারবুদ্ধি বলে যে ব্রহ্মবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ ছেড়ে ভারতবর্ষ এক সময় একেশ্বরবাদের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সাহিত্যে তার কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই। George A. Grierson-এর ধারণা সূর্যপূজা থেকেই একেশ্বরবাদের ধারণার উদ্ভব হতে পারে। তবে কেউ যদি ঋগ্বেদিক সূক্তসমূহ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন তাহলে সেখানেই ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদীয় প্রবণতা লক্ষ্য করবেন। সূর্যপূজা যে আর্যদের সঙ্গে নিকট সম্পর্কে যুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ কি! ইরাণে জরথুস্ত্রবাদীরা সূর্যপূজা করতেনই। বৈদিক মানুষ সূর্যস্তব কম করেননি। তবে সূর্যকে কেন্দ্র করে তেমন মঠ মন্দির এদেশে গড়ে ওঠেনি। যা গড়ে উঠেছিল তার সামান্যই টিকে আছে, যেমন কোণারকের সূর্যমন্দির যেখানে আর পুজো হয় না। জাগ্রত মন্দির একটিই আছে সেখানে আজও পুজো হয়—কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দির। সুতরাং আর্যরক্তের এই যে ধারা, তা থেকেও একেশ্বরবাদের চিন্তা জাগ্রত হতে পারে বইকি। তবে বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে মাটির সূর্য তৈরি করে পুজো করার যে প্রবণতা তাতে মনে হয় লোকবিশ্বাসেও এর স্থান ছিল।

১. শতপথ ব্রাহ্মণ— ৮. ১. ৪. ১০

অনেকে লোকবিশ্বাসকে প্রগার্য চিন্তা বলে মনে করেন। বস্তুত বহু লোক-সংস্কৃতির মূলেই দেখা যায় বৈদিক ধর্মীয় প্রথার অনুমোদন নেই।

যত সব কিংবদন্তী আছে তাতে দেখা যায়, যে ভাবেই হোক সূর্যের সঙ্গে ভাগবতধর্মের অর্থাৎ 'একমাত্র ভগবান' এই বিশ্বাসের যোগ রয়েছেই। মহাভারতে দেখা যায় এমন কাহিনী রয়েছে যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং এই ধর্মের মূল কথা শিক্ষা দিচ্ছেন নারদকে। নারদ আবার যাদের এই ধর্ম শিখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সূর্য হলেন অন্যতম। সূর্য থেকেই মনুষ্যসমাজ ভাগবতধর্মের সূত্র পায়। দেখা যায় নারায়ণ অর্থাৎ এক-মাত্র ভগবানের অবতার হিসেবে উত্তর ভারতে যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি পূজিত সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আসছেন সূর্যবংশ থেকেই। অপর পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসছেন চন্দ্রবংশ থেকে (সেই জন্যই কি পরবর্তী কালে তাঁকে অবতারত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল অর্থাৎ সূর্যবংশজাত ছিলেন না বলে ? অবশ্য অবতারেরও অধিক মর্যাদা নিয়েই তিনি ভাগবতদের কাছে স্থান পেয়েছেন। স্থান পেয়েছেন পুরুষোত্তম হিসেবে)। ভাগবতে বহু ঋষিবংশকেও দেখা যায় সূর্যের সঙ্গে যুক্ত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে সূর্য সম্পর্কহীন ছিলেন তা নয়। দেখা যায় মহাভারতে সূর্য দ্রৌপদীকে সে অনিঃশেষ খাদ্যপাত্র দিয়েছিলেন তার সঙ্গে ভগবান কৃষ্ণের একটা যোগা-যোগ আছেই। শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর ছিলেন সূর্যের উপাসক। এবং সূর্যের কাছ থেকে এমন একটি রত্ন পেয়েছিলেন যাকে ঘিরে বহু গল্পকথাও গড়ে উঠেছে পরে। বৈদিক ঋষি যাজ্ঞবাল্ক্য গুরুর নির্দেশ অস্বীকার করে সূর্য-পূজা করেছিলেন। ভাগবতীয় মৃত্যুতত্ত্বে উল্লেখ আছে যে মৃত্যুর পর আত্মা পিতৃলোক অর্থাৎ সূর্যলোক পার হয়ে তবে উপাস্য দেবতা নারায়ণ বা বিষ্ণুর কাছে গমন করে। ভাগবতধর্ম যাঁরা প্রচার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম দিকের প্রচারক নিম্বার্ক সূর্যের অবতার হিসেবেই তাঁর ভক্তদের কাছে পরিচিত। উত্তর ভারতীয় ভাষায় 'ভাগবত সূর্যই' 'সূরয ভগবান' নামে প্রচারিত। ভাগবত ধর্মের পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায় যে, ভক্তের উপাস্য ঈশ্বর 'বিষ্ণু' নামে পরিচিত, যে বিষ্ণু প্রাচীন বৈদিক

সাহিত্যে ছিলেন সূর্যদেবতা মাত্র।

ভাগবত একেশ্বরবাদের উদ্ভব সূর্যপূজা থেকেই হোক বা নাই হোক কতকগুলি তথ্যকে আমাদের মেনে নিতেই হবে, যেমন ভাগবত-ধর্মের যথার্থ-প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণ বাসুদেব। পিতা বসুদেব বলে তিনি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব পুত্র 'বাসুদেব'।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যশিক্ষা হয়েছিল ঘোর অঙ্গিরস ঋষির কাছে। যার পর জ্ঞানের তৃষ্ণা আর থাকেনি।[১] শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মধ্য আর্য ভারতীয় সামান্ত রাজ্যস্থ যাদব বংশোদ্ভূত সাত্বত। মহাভারতের প্রাচীন অংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দুটো ভূমিকায় দেখা যায়—বীরযোদ্ধা ও ধর্মসংস্কারক। তিনিই পরম উপাস্যকে 'ভগবত' নামে উল্লেখ করেন। সেই থেকে এই ভগবতের উপাসকেরা 'ভাগবত' নামেই পরিচিত। প্রথম এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল যদুবংশই। পরে আর্য-মধ্যভারতীয় প্রান্তদেশে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই উপাস্য ঈশ্বর হিসেবে সম্মান লাভ করেন।

বাসুদেব ভাগবত ধর্মের যে সারতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন তা হল এই যে, পুরুষোত্তম অসীম, শাশ্বত ও করুণাময়। তাঁর সান্নিধ্যে যে চিরন্তন আশীর্বাদ রয়েছে সেই আশীর্বাদ লাভ করাই হোল মোক্ষ।

ভারতীয় মানসিকতার মধ্যে একটা দার্শনিকতার মানসিকতা রয়েই গেছে। সুতরাং ভাগবত ধর্মে যে একেশ্বরবাদীয় ধারণা আত্মপ্রকাশ করে এক সময় তাও দার্শনিক চিন্তায় উদ্ভাসিত হয়ই। মধ্যভারতীয় ব্রহ্মবাদীয় ব্রাহ্মণত্ব সহজে একেশ্বরবাদীয় এই ভাগবতধর্মকে স্বীকার করেনি। সুতরাং ভাগবতেরা প্রান্তদেশীয় দার্শনিক চিন্তার নীতিতেই আকৃষ্ট হন। দুটো বড় ধরনের দর্শন তখন ছিল সাংখ্য ও সাংখ্যজাত যোগ। তত্ত্বের সংখ্যায় পরম তত্ত্বকে ধরার চেষ্টা হয়েছিল বলেই বোধ হয় এই দর্শনের নাম সাংখ্য, যার মধ্যে রয়েছে পঁচিশটি তত্ত্ব। বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষাতে একে বলে মাত্রা। বর্তমান বিজ্ঞান সত্যানুসন্ধানে এই মাত্রা অনুমান

১. ছান্দোগ্য উপনিষদ—৩. ১৭. ৬

করেছেন ২৬টি।[১] যোগ হল যতক্ষণ বোধ ততক্ষণ এই মানবদেহের মৌল শক্তির (কুলকুণ্ডলিনীর) উত্তরণ পর্যায়ে বোধের সাহায্যে এই সংখ্যার মূল্যায়ন। এই জন্যই বোধ হয় যোগকে বলা হয় সাংখ্যদুহিতা।[২] এই সাংখ্য ও যোগ যে শুধু ভাগবতধর্মকেই প্রভাবিত করেছিল তা নয় পরবর্তীকালে পূর্ব ভারতে জৈন ও বৌদ্ধধর্মকেও প্রেরণা দিয়েছিল অনেক।

সাংখ্য দর্শনের মূলে কিন্তু ঈশ্বরের কোন বালাই নেই। পুরুষোত্তম বা শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে কোন দেবতার ধ্যান-ধারণার প্রতি সাংখ্যদর্শনের সমর্থন তো নেই-ই বরং অস্বীকৃতিই আছে। কোন নৈতিকতা নিয়েও এর মাথাব্যথা নেই। অপরপক্ষে ভাগবত ধর্মের মূল কথাই হল উপাস্য সর্বোত্তম ঈশ্বর। আর নৈতিকতার গন্ধ তো এর সারা দেহে লেগেই আছে।

এই যে দুই বিরুদ্ধ চিন্তা তার মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছে যোগদর্শন। যোগ দ্বারা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা অর্জন করার যে ধারা, ভারতবর্ষে তা বহুকাল ধরেই প্রচলিত। সেই সিন্ধু সভ্যতায়ও যোগাসনে বসার ভঙ্গীতে মৃত্তিকাফলক ও মূর্তি পাওয়া গেছে। পশুপতি যে আসনে উপবিষ্ট তার নাম কূর্মাসন। এর যথার্থ মূল্য এই যে—কূর্মের হস্তপদের মত যোগকালে প্রবৃত্তিগুলিকে গুটিয়ে নিতে হয় ভেতরে। তাহলে মহাবিশ্বের নৃত্যছন্দে cosmic dance-এ মনপ্রাণ দোলায়িত হয় স্বতই এক সময় সকল প্রকার নৃত্যছন্দও বন্ধ হয়। তখন প্রশান্তি। যোগের এই অভূতপূর্ব ক্ষমতার দ্বারাই সাংখ্য দর্শনের বক্তব্যগুলিকে অনুধাবন করার চেষ্টা হয়। তবে যোগের মধ্যে নৈতিকতার যে গন্ধ পাওয়া যায় তা তাকে ভাগবতধর্মের সঙ্গেও যুক্ত করে। সুতরাং যোগ হল সাংখ্য ও ভাগবত ধর্মের মধ্যে যোগাযোগের সেতু। বাস্তব ও অতিবাস্তব সত্যের মধ্যে সংযোগ।

১. Beyon Einstein—M. Kaku ও J. Trainer.

২. Bhakti Marga—George A. Grierson.

দর্শন ধর্মের এমনই এক অঙ্গ যা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেইজন্য যোগ-বহুল প্রচারের উদ্দেশে নিজেকে ভাগবত ধর্মের সঙ্গেই যুক্ত করে। বিনিময়ে নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য থেকে তার উদ্ভব হলেও যোগব্যবস্থা ঈশ্বরবাদী। অথচ যোগদর্শনের সঙ্গে ঈশ্বরের যথার্থই কোন যোগ নেই। এ যেন বাইরে থেকে কোন দেহে বিশেষ কোন বীজাণু প্রবেশ করার মত ঘটনা। যে বীজাণু দেহে প্রবেশ করলেও যোগদেহে কোন বিকৃতি ঘটাতে পারেনি সামান্য। অপর পক্ষে যোগদর্শনের সঙ্গে যোগাযোগ হবার জন্য ভাগবতধর্ম লাভ করে ভাগবত শাস্ত্র ও বিশেষ কতকগুলি শব্দ যার মধ্যে 'যোগ' শব্দটিও একটি। যোগের আদি বক্তব্য ছিল চিন্তার নিবিষ্টতা। ভাগবতধর্মে এর অর্থ দাঁড়ায় ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্তি। ফলে ভক্তিসূত্রও এর মধ্যে এসে যায়— কিন্তু ভক্তির মধ্যে যে প্রেম জাতীয় জিনিস থাকে তা বর্জিত হয়ে। সাংখ্যযোগ দর্শন থেকে ভাগবত ধর্ম আর যে শব্দটা লাভ করে তা হল 'পুরুষ'—যাকেই ভাগবতে বলা হয়েছে ঈশ্বর।

সাংখ্য অবশ্য পুরুষ শব্দকে মনে করত মানুষের 'আত্মা'। যোগের যে অস্পষ্ট 'ঈশ্বর' তার অর্থ বোধহয় ছিল সর্বোত্তম ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী বিশেষ আত্মা, যাকে বলে পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই পুরুষ। আর ঈশ্বর হিসেবে এই পুরুষ শব্দকেই ভাগবতধর্মীরা গ্রহণ করেছিলেন। পরে অবশ্য এই ঈশ্বরের নাম হিসেবেই আসে 'নারায়ণ' শব্দ—অর্থাৎ আদি নর। তবে তত্ত্বকারদের মতে নারায় (জল) যার বাস (অয়ণ), তিনিই নারায়ণ—অর্থাৎ দেশস্থ (space) সৃষ্টিবীজ। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এই ধর্ম প্রচার করেই ঈশ্বরীয় মর্যাদা পেয়েছিলেন। ঈশ্বর অর্থে বাসুদেব শব্দটিও সেই জন্যই এসে যায়।

ভাগবতধর্মের দ্বিতীয় পর্যায় হল মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক এই ধর্ম গ্রহণ। এর কারণ হিসেবে জার্মান পণ্ডিত গার্বে মনে করেছেন, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এতদঞ্চলে মরণপণ লড়াই।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ভাগবত ধর্মের কোন মিলই নেই। ব্রহ্মবাদের গন্ধ

গায়ে থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম শেষ পর্যন্ত ভাগবত ধর্মকে নিজেদের মধ্যে মেনে নিতে পেরেছিল। তবে এই মৈত্রীর জন্য যোগদর্শনের মত ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অনেক ত্যাগ করতে হয়েছিল। যেমন ভাগবত ঈশ্বরকে বৈদিক সূর্যদেবতা বা বিষ্ণুর সমকক্ষ করেই দেখাতে হয়েছিল। ক্ষত্রিয়দের একেশ্বরবাদীয় ধারণাকেও স্বীকার করে নিতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। তবে ক্ষত্রিয়দের এ ধর্মীয় বিশ্বাস স্বীকার করে নিতে ব্রাহ্মণদের কিন্তু খুব বেশি অসুবিধায় পড়তে হয়নি। এমন গল্পকথা পেতে অসুবিধা হয়নি—যেখানে দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের ধর্মই পালন করছেন আবার ক্ষত্রিয়রাও কর্তব্য করছেন ব্রাহ্মণদের। দেখা গেল ভাগবত ধর্মের অন্যতম প্রচারক রাজর্ষী জনক পর্যন্তও ব্রাহ্মণ হয়ে যাচ্ছেন।[১] মনুর মত সংহিতা-রচয়িতাকেও দেখা যচ্ছে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় শিক্ষকের কাছে ব্রাহ্মণেরা শিক্ষার্থে যেতে পারবেন এমন কথা স্বীকার করে নিচ্ছেন।[২] শেষপর্যন্ত ব্রাহ্মণদের মান রাখতে ব্রাহ্মণ পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয় ধ্বংস করে বিষ্ণুর অবতার হলেন। অবশ্য ক্ষত্রিয়দেরও খুশি করতে হবে, তাই ক্ষত্রিয় অবতার শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করলেন। এই যে মানসিকতা এটাই ব্রাহ্মণ মানসিকতা। অর্থাৎ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নরম হওয়া। যে দিন ব্রাহ্মণেরা এটা হারিয়েছে সেদিন ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম নিজের এবং হিন্দু সমাজের ক্ষতি করেছে। অবশ্য এই উনবিংশ শতক পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা নানা ভাবেই বাঁচার তাগিদে তাদের মনোভাব নরম করেছে। বহু আঞ্চলিক দেবদেবী তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। গল্পকথা তৈরি করে অহমদের মত জনগোষ্ঠীকেও হিন্দুসমাজভুক্ত করা হয়েছে। শিবের মত দেবতা, মনসার মত দেবী ব্রাহ্মণ্য পুজার বেদীতে স্থান পেয়েছেন। বহিরাগতরা ভারতীয় হয়েছে ক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত হয়ে, যেমন রাজপুত। বহুদিন যাবৎ আদিম বহু

১. শতপথ ব্রাহ্মণ ৯. ৬. ২. ১০ (ততো ব্রহ্মা জনক আস।)

২. মহাভারত (১৩. ২৯১৪, ২৩৯৭); বিষ্ণুপুরাণ (৪. ৩. ৫.) মৎস্যপুরাণ (৩২. ১১৫) মনু (২. ২৪১)

নরগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসে হাতই দেওয়া হয়নি। অবশ্য তাদের ভূতপ্রেত অধ্যুষিত দেবদেবীকে পুজো করার জন্য কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতও এগিয়ে আসেননি। তবে ভাগবতধর্ম বহুক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্য বিরোধী নরগোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণ্য সীমানার মধ্যে নিয়ে এসেছে। বিপরীতের মধ্যে এই মিলনের গন্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাচীন অংশে লক্ষ্য করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদগীতার যে মহান নৈতিক বক্তব্যগুলি তা সবই ভাগবতধর্ম জাত। এখানে দেখা যাচ্ছে বাসুদেব বিষ্ণুর মত দৈবীসত্তা পেয়ে গেছেন। তবে ব্রাহ্মণ্য যে বহু দেবীয় শ্রেণী তাতে তখনও স্থান পাননি। বাসুদেবের ব্যক্তিগত নাম 'কৃষ্ণ' হিসেবে তিনি বিষ্ণুর মর্যাদা পাচ্ছেন। অবশ্য এই বিষ্ণুও যে আর্য চিন্তাজাত নয়, তাতো নয়! শব্দতত্ত্বের বিচারে দেখা যায় বিন্ (আকাশ) এই তামিল শব্দ থেকে বিষ্ণু শব্দের উৎপত্তি। বিষ্ণুর আবির্ভাবের পেছনেও রয়েছে দ্রাবিড় মানসিকতা, আর্য ব্রাহ্মণ্য মানসিকতা নয়। সেই জন্য মনে হয় ভাগবতধর্মের সূচনা সেই ঋগ্বৈদিক আমল থেকেই। ইদানিং তো দেখা গেছে ঋগ্বেদের বহু সূক্ত অনার্যদের দ্বারা সৃষ্টি।[১]

ঘটনা যাই হোক, দেখা যাচ্ছে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে ভাগবতধর্মও ব্রাহ্মণদের পরিধির মধ্যে বেশি করে পড়ে গেছে। ব্রাহ্মণদের এই প্রভাব শ্রীমদ্ভগবদগীতার শেষভাগে বেশ ভাল ভাবেই লক্ষণীয়। উত্তর ভারতে মধ্যদেশীয় প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। সে-জন্য দেখা যায় ভাগবতেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বীকার করে নিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত মহাভারতে দেখা যাচ্ছে পুরুষোত্তমকে বলা হচ্ছে – তিনিই অস্তিত্ব, তিনিই অনস্তিত্ব। তিনি অরূপ, আবার তিনি রূপও ধারণ করছেন। কখনও বলা হচ্ছে চর্মচক্ষে তিনি দর্শনীয় নন, আবার দেখা যাচ্ছে অনুরক্ত ভক্তের কাছে তিনি রূপ ধরে আবির্ভূত হচ্ছেন।[২] তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে কোলাকুলি করার জন্য ভাগবতদের ক্ষতি হয়েছে এই যে, তাঁদের উপাস্য দেবতা অনেকটাই

১. An Introduction to the Study of Indian History – D. D. Kosambi

২. মহাভারত, নারায়ণীয় অধ্যায় ; ভাগবত পুরাণ – পঠিতব্য।

অস্পষ্ট হয়ে দূরে সরে গেছেন। সে জন্য অবশ্য যথার্থ যে ভক্ত তার মধ্যে দর্শনের জন্য প্রচণ্ড আর্তি ফুটে উঠেছে। ভাগবতধর্ম যখন এই ভাবে সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছিল ঠিক তখনই ভারতে অবতার-বাদের উদ্ভব ঘটে। দেখা যাচ্ছে নানা যুগে, নানা ভাবে, নানা রূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করছেন। ঈশ্বরকে এই রূপের বন্ধনের মধ্যে ধরতে পেরে ভক্তের ভক্তি তার পথ খুঁজে পেয়ে সার্থক হয়েছে।

ঈশ্বর অবতার হচ্ছেন, এ চিন্তা ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যেও এধরনের গল্প আছে। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যাচ্ছে কখনও এ দেবতা, কখনও ও দেবতা—যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রমুখ রূপ ধরে দেবতাদের রক্ষা করছেন, বিশ্ব জয় করেছেন। যখন ভাগবতধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মে প্রবেশের অধিকার পায় বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ভাগবত ধর্ম স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে, এই রূপ ধারণ করছেন যুগে যুগে বিষ্ণু স্বয়ং, আর কেউ নন। আর কোন শক্তিই নয়। হয়তো অভিজ্ঞান পুজোর সূত্র ধরে কখনও তিনি হয়েছেন মৎস্য, কখনও কূর্ম, কখনও বরাহ, নরসিংহ, বামন ইত্যাদি। পরে দেবোপম পুরুষ, পূর্ণাঙ্গ নব, সবাই অবতার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন যেমন, শ্রীরামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রমুখ অবতার। অবতার দশ। এদের মধ্যে দুজন অন্তত পরে এসেছেন ক্ষত্রিয় সমাজ থেকে, যেমন শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ। পরে বৌদ্ধদের ব্রাহ্মণ্য সমাজে অনুপ্রবিষ্ট করানোর প্রয়োজন হলে আসেন বুদ্ধ।

ভাগবতদের কাছে স্বভাবতই শ্রীরামচন্দ্র ও কৃষ্ণ বিশেষভাবে পূজনীয়। পরে অবশ্য কম করেও চব্বিশবার ঈশ্বর অবতার রূপ গ্রহণ করেন। এই যে অবতার, এঁরাই হন সরাসরি উপাস্য দেবতা। এইজন্য গল্প আছে—একদা যখন কোন প্রচারক জনগণকে অদৃশ্যকে দর্শন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তুলসীদাস তখন তাঁকে বলেন—অদৃশ্য দেখার চেষ্টা করছেন কেন? ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করুন সব দর্শন একবারে হবে।

ভক্তি যে শুধু ভগবানের পুরুষ রূপের মধ্যে থেকেছে তা নয়। ঈশ্বরের

শক্তি হিসেবে এসেছেন নারীমূর্তি। আপন মহিমার উদ্ভাসনে দেবী শক্তি। নারীরূপে শক্তিকে উপাসনা করার এই প্রথা শৈবধর্মে বেশ প্রকট। তবে ভাগবতদের মধ্যেও যে এই প্রবণতা দেখা যায়নি—তা নয়। ভগবান বিষ্ণু যেমন ভাগবতদের কাছে উপাস্য দেবতা, লক্ষ্মী তেমনই উপাস্য দেবী। শক্তি পুরুষ থেকে অভিন্ন, তবু ভিন্ন। শক্তির আবির্ভাবে শক্তিমান যে বিকৃত হচ্ছেন, নিজের সত্তা হারাচ্ছেন তা নয়। আবার পদার্থিক সত্তা যে তাঁর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তাও নয়। আসলে শক্তিমান থেকে শক্তি অবিচ্ছেদ্য। এই কারণেই বোধহয় বহু ধর্মগ্রন্থ শক্তি সম্পর্কে নীরব। এইসব গ্রন্থকারদের বক্তব্য, তিনি (শক্তি) তাই করছেন শক্তিমান যা করাচ্ছেন। শক্তিমানের কথা বলা হলে শক্তির কথাও বলা হয়। অথচ দেখা যাচ্ছে শক্তিকে কল্পনা করা হচ্ছে সনাতন ধর্মের প্রচারিকা হিসাবে। ভাগবত—একেশ্বর ভাগবত ধর্মে তিন হয়ে দেখা দিচ্ছেন—ঈশ্বর, অবতার ও অবতার-শক্তি। খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই ত্রিশক্তিরই প্রকাশ ঘটছে ভগবান, সন্তান (যিশু, অবতার)ও হোলি গোস্ট[১] (শক্তি) হিসেবে। এই দেখে অনেকের ধারণা ভাগবতীয় ত্রিত্বের ধারণা খ্রীষ্টান ত্রিত্ব থেকেই এসেছিল।

সে যাই হোক, ভাগবতীয় একেশ্বরবাদ মধ্যদেশে গৃহীত হলেও পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্যান্য দেবতাদেরও পূজা প্রচলিত ছিল—যেমন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও আরো অসংখ্য ছোটখাটো দেবদেবী। অবশ্য ভাগবতধর্মে যাঁরা আকর্ষণ বোধ করেন এজন্য তাঁদের এইসব বহুদেববাদের বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে হয়নি। বিষ্ণুই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপাস্যরূপে পরিগণিত হন। এক সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সমান মর্যাদা লাভ করলেও ভাগবতধর্ম গ্রহণের পর ভারতে ব্রহ্মার মর্যাদার আসন অনেকটাই নিচে নেমে যায়। ব্রহ্মা শব্দটির মধ্যে সীমাহীনতার একটা

---

১. Holy Ghost—সিরিয় খ্রীষ্টানদের কাছে স্ত্রীলোক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিলেন। কুমারী মেরীকে তাঁরা হোলি গোস্ট-এর সঙ্গে এক করে দেখতেন।

গন্ধ লেগে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি বিষ্ণুর অধীনে প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনকারী সীমিত ক্ষমতার দেবতারূপে আবির্ভূত হন। তবে যত তাড়াতাড়ি ব্রহ্মাকে তাঁর নিজের আসনচ্যুত করা গিয়েছিল—তত দ্রুত শিব বা রুদ্রকে করা যায়নি। মধ্যদেশীয় প্রান্ত অঞ্চলে এই দেবতার অনুগামীরা ছিলেন রীতিমত প্রভাবশালী। তাঁদের বলা হত পাশুপত। ভাগবতীয়দের মত তাঁরাও সাংখ্য-যোগ দর্শন দ্বারা যথেষ্টই প্রভাবিত হয়েছিলেন। রুদ্রকে স্থানচ্যুত করে ভাগবত ঈশ্বর অর্থাৎ বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে শেষ পর্যন্ত তাই উভয়ের মধ্যে একটা সংগ্রামের অবতারণাও করতে হয়েছিল। অবশেষে রুদ্র অবশ্য বিষ্ণুর প্রাধান্যই স্বীকার করে নেন। যদিও বর্তমানে এই ত্রয়ীর অর্থ করা হচ্ছে ভিন্নভাবে—অর্থাৎ কালের তিনটি দিক হিসেবে, যেমন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ব্রহ্মা—অতীত, অতীতে সৃষ্টি করেছিলেন: বিষ্ণু বর্তমান, বর্তমানেও পালন করছেন, পরিণতিতে ভবিষ্যতে ধ্বংস, রুদ্র এই ভবিষ্যৎ অর্থাৎ ধ্বংসের প্রতীক।[১] কিন্তু ভাগবত ভক্তিধর্মে এই ভাবাদর্শ মূর্তির রূপ লাভ করে। তবে উপরোক্ত সংগ্রামে ভগবান বিষ্ণুও একটা মীমাংসার সুরেই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—'যিনি আমাকে জানেন তিনি তোমাকেও জানেন। যাঁরা তোমাকে অনুসরণ করেন তাঁরা আমারও অনুগামী। আমাদের দুইয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই।'[২] এই জন্যই বোধহয় কথাটা এসেছে—'হরিহর আত্মা'। মহাভারতেই আরও বলা হয়েছে, প্রলয় কালে বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হন। তখন তাঁর ললাট থেকে রুদ্রের জন্ম হয়।

ভাগবতেরা রুদ্রকে এক সময় বিষ্ণুরই ভিন্ন রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

---

১. The sages of India meditated upon the nature of time and arrived at thoroughly scientific conclusions. The three faces Trimurty was invented by to symbolise three faced-time—Beyond the Time Barrier—Andrew Tomas P. 34

২. মহাভারত—৩৪৪ অধ্যায়, দ্বাদশ গ্রন্থ।

চন্দ্রহাসের মত পরম বৈষ্ণবও এইজন্যই শিবের মন্দিরে বিষ্ণুর প্রাতঃকালীন নাম করতেন। দুর্গা মন্দিরেও নামকীর্তন করা হত। শিবকে সহজে গদিচ্যুত করা না গেলেও অসংখ্য অন্যান্য দেবতাকে সহজেই তাঁদের মর্যাদাচ্যুত করা গিয়েছিল। এঁদের সবারই স্থান হয়েছিল ভগবান বিষ্ণুর নিচে। তাঁরা বিষ্ণু নির্দিষ্ট কাজই করতেন।

তবে এত সত্ত্বেও ভাগবতেরা যে সাংখ্য যোগ দর্শন থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল তা নয়। এর ফলে এমন ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে, সবাই সেই এক ঈশ্বর বিষ্ণুর অংশ মাত্র। অপর পক্ষে বস্তু ও আত্মার মধ্যেও একটা প্রভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সবই বিষ্ণুর অংশ এমন ভাব শ্রীমদ্ভগবদগীতার শেষ ভাগেও লক্ষণীয়।

ভাগবতধর্ম সকল বিপরীতের মধ্যে একটা সমন্বয় আনার চেষ্টা করেছে। কতদূর মিশেছে বলা দুষ্কর। তবে তেলে-জলে মিশ যাবার মত মিল হয়েছিল সন্দেহ নেই।

নবম শতাব্দীতে শঙ্কর বেদান্ত দর্শন রচনা করে ভাগবত ধর্মের একেশ্বরবাদকে চ্যালেঞ্জ জানান! এতে ভাগবতপন্থীদের অনেকটাই রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে হয়। অবশ্য প্রতি-আক্রমণ করার জন্য দুটো ভিন্ন ভিন্ন পথও তাঁরা বেছে নেন। প্রথমতঃ ভাগবতীয়রা ব্রহ্মান সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে শঙ্করের পার্থক্যের ক্ষেত্রে শঙ্করভাষ্যই মেনে নেন। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মিক চিন্তা ভাবনা ত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে সাংখ্য যোগ দর্শনের প্রতি পুনরায় আকর্ষণ বোধ করেন। এই যে বিরোধ তা দ্বাদশ শতাব্দীতে চূড়ান্ত এক রূপ নেয়। ভাগবতদের পক্ষে শঙ্করপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এগিয়ে আসেন রামানুজ ও মধ্ব।

রামানুজ ও মধ্বের আবির্ভাবের পরেই ভক্তিবাদী আন্দোলন তার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করে। এ পর্যায় সম্পর্কে যদি ভাল করে জানতে ইচ্ছে করে তবে তার তিনটি সূত্র আছে—(১) শ্রীমদ্ভগবদগীতা। (২) মহাভারতের নারায়ণীয় অধ্যায় (৩) ভাগবত পুরাণ ও ভক্তমাল। এ ছাড়া আরও অসংখ্য গ্রন্থ তো রয়েছেই।

উপাস্য হিসেবে একইমাত্র দেবতা আছেন যেমন নারায়ণ, পুরুষ, অথবা বাসুদেব। অনন্ত কাল ধরেই তিনি আছেন। চিরন্তন স্থিতি ও সর্ব ব্যাপ্তি থেকেই তাঁর নাম অনন্ত, অক্ষয় হিসেবে অচ্যুত, ও অবিনাশী হিসেবে অবিনাশিন। অব্যক্ত উপাদানের সাহায্যে তিনি এই বস্তু-জগৎ তৈরি করেছেন—যার নাম প্রকৃতি। আদিতে হয়তো বিশ্বাস ছিল যে, এই অদ্বিতীয় পুরুষ মহাশূন্যতা থেকেই বিশ্বজগৎ তৈরি করেন। পরে সম্ভবতঃ সাংখ্য-যোগ প্রভাবে উপাদান হিসেবে প্রকৃতির কথাও মেনে নেওয়া হয়। এই প্রকৃতির অস্তিত্ব যেন পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র। অবশ্য বর্তমানে দ্বিত্বের স্বীকৃতি কিছুতেই নেই। কেন না দুই অর্থাৎ বস্তু ও অবস্তু matter ও anti-matter হলে সংঘর্ষে সব লয়ই পাবে, সৃষ্টি হবে না। সৃষ্টির জন্য চাই তিনের উপস্থিতি। বিজ্ঞানও তাই সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে বলছে তিনটি fundamental particles-এর কথা।

সে যাই হোক ভাগবতদের মতে পরম পুরুষ থেকেই জীবের অর্থাৎ জীবাত্মার উদ্ভব। জীবাত্মা চিরস্থায়ী। জীবাত্মার ধ্বংস নেই। পরমপুরুষই ব্রহ্মা ও শিবকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন আরও সব অসংখ্য দেবদেবী। এঁদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর নির্দেশ হিসেবে কাজ করার জন্য, যথার্থ অধ্যাত্ম সত্য প্রচারের জন্য। বিশ্বজগৎকে নিয়মের মাধ্যমে এঁরাই শাসন করেন। তবে প্রয়োজন হলে স্বয়ং ঈশ্বর অবতার হিসেবে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। অবতীর্ণ হন তাঁর অনুরাগীদের রক্ষা করতে (যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানং অধর্মস্য, তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। পরিত্রাণায় সাধুনাম্, বিনাশয় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে)। ঈশ্বর যত অবতার রূপ ধারণ করেছেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার রূপ হল শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের। ভারতবর্ষে ঐশ্বরিক করুণা, 'পিতা ঈশ্বর' প্রভৃতি ভাব ভাগবতধর্মের মধ্য দিয়েই এসেছে।

ভাগবত ধর্মে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবেই সাংখ্য-যোগ তত্ত্ব অনুসারে। তবে এই তত্ত্ব অতিবিষয়ী বাসুদেবকে বিষয়ী প্রকৃতির মধ্যে ধরে আনতে গিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই। বাসুদেব বাসুদেব হিসেবে

এসেছেন স্তরে স্তরে তিনটি ব্যূহ ভেদ করে।

বাসুদেব নিজের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই হল সাংখ্যের আদি অব্যক্ত বস্তুসত্তা। একই সঙ্গে এমন এক শর্তাধীন শক্তির মধ্যে প্রবেশ করেছেন যাকে বলে সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন হয় মনস-এর—সাংখ্যে যাকেই বলা হয়েছে বুদ্ধি। একই সময় সঙ্কর্ষণ প্রবেশ করেছেন শক্তির এমন এক শর্তাধীন পর্যায়ে যাকে বলে প্রদ্যুম্ন। মনস-এর সঙ্গে প্রদ্যুম্নের সহযোগে উৎপন্ন হয়েছে অহংকারের অর্থাৎ চিৎসত্তার (তথাকথিত চিৎসত্তার তন্মাত্রিক অবস্থা)। প্রদ্যুম্ন তখন শর্তাধীন শক্তির তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছেন—যার নাম অনিরুদ্ধ। অহংকার ও অনিরুদ্ধ থেকে জাত হয় সাংখ্য মহাভূতস। মহাভূত অর্থ হল স্থূল পদার্থিক সত্তা। এতেই দেখা দেয় স্থূল জাগতিক গুণ। এখানেই জন্ম হয় দেবতা ব্রহ্মার, যিনি এই পদার্থিক সত্তা থেকে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন (James Wallace এই ব্রহ্মাকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নিউট্রন ফিল্ড জাতীয় অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন)।[১]

জীবকে যদি এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড থেকে মুক্তি পেতে হয়—তবে ভক্তিই একমাত্র পথ। এই ভক্তি সেই একমাত্র উপাস্যের প্রতি ভক্তি, তাঁর অবতারের প্রতি ভক্তি, অন্য কারো প্রতি নয়। সুতরাং অবতার পুজার বিধি থাকলেও ভাগবত ধর্ম যথার্থই একেশ্বরবাদী ধর্ম। এখানে কোন প্রকার দ্বিধা যদি থাকে তবে তা 'দেব' শব্দ ব্যবহারের জন্য। কিন্তু ভাগবতদের 'দেব' শব্দ হল ইহুদীদের এলোহিম শব্দতুল্য, যার অর্থ সর্বোত্তম দেবতা। কখনও কখনও তারই অনুগত অন্য কোনও শক্তিকেও বোঝায়। এই ভাগবতীয় 'দেবশব্দ' দ্বারা যেমন উপাস্য একমাত্র দেবতাকে বোঝায়, তেমনই ব্রহ্মা, শিব প্রমুখকেও বোঝায়। এই অধীনস্ত দেবতাদের উপাসনা করা গেলেও একমাত্র উপাস্য কিন্তু সেই পরমেশ্বর—ভগবান। ভাগবতরা তাই বার বার বলেছেন যে, যথার্থ ভক্তকে 'একান্তিন' হতে হবে অর্থাৎ একান্তই একেশ্বরবাদী।

---

১. Brahman $E=mc^2$—James Wallace.

এখন প্রশ্ন মুক্তির জন্য কর্মের প্রয়োজন কতটুকু? ভাগবতাদের বিশ্বাস, কর্মের প্রভাব পরোক্ষ। প্রত্যেক কর্মেরই — তা ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন, কর্ম অনুযায়ী ফল আছে। ভাল কাজ করলে হয়তো আত্মা ভিন্ন কোন লোক গিয়ে সাময়িক কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে — কিন্তু যাকে বলে মোক্ষ, তা পাবে না। কর্মের সুখ চিরন্তন নয়। কর্মফল শেষ হলেই আত্মা আবার পৃথিবীতে ফিরে এসে জন্মমৃত্যুর আবর্তের মধ্যে পড়বে। যদি কেউ নিষ্কাম কর্ম করে, ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে শুধু মাত্র ঈশ্বরের নামেই কাজ করে, তাহলে সে কর্মের ফল অমর। এ ধরনের কর্মের ফলে ঈশ্বর স্বয়ং জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করে ভক্তির সঞ্চার করেন। এই ভক্তিই দান করে চিরন্তন মুক্তি। ভক্তির এই বাণী — যা প্রায় ভারতবর্ষে বর্তমানে সর্বজনিক, তা এই ভাগবতদেরই দান।

জীবাত্মা ভাগবতদের মতে পরমেশ্বরেরই অংশ মাত্র, তাঁর থেকেই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রূপে উৎপন্ন। একবার স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করলে সেই সত্তা চিরন্তন-ভাবে বিরাজ করে। ভারতীয়েরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। ভাগবতীয়রা মনে করেন যে, যতক্ষণ ভক্তিরসের দ্বারা জীবাত্মা সিক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। এই মুক্তি ব্রহ্মবাদিনদের মত চির প্রশান্ত বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাওয়া নয়, এ হল নিত্যমুক্ত অবস্থা। অর্থাৎ আত্মা বন্ধনমুক্ত হয়ে ঈশ্বরবোধের অপার আনন্দ বোধ করবে। কিন্তু সাধারণ জীবের অবস্থা কি? সাধারণ জীব ক' ধরনের? তারা চার ধরনের। যেমন, (১) বদ্ধজীব। যারা কামনা বাসনা দ্বারা পার্থিব জগতের প্রতি আকৃষ্ট। মুক্তির দুয়ার এদের কাছ থেকে অনেক দূরে। (২) মুমুক্ষু। এরা হল সেই ধরনের জীব, যাদের মধ্যে মোক্ষ লাভের জন্য চেতনা জন্মেছে। কিন্তু মোক্ষ লাভের জন্য তৈরি নয়। (৩) কেবল বা ভক্ত। এরা হৃদয়ের দিক থেকে নির্মল। এক ঈশ্বরের প্রতিই অনুরক্ত, ভক্তি লাভ করে মুক্তি পথের যাত্রী। (৪) মুক্ত। এরাই হল বন্ধনমুক্ত। এঁরা সচেতন ভাবে ভগবতপদে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে শাশ্বত অবস্থায় বিরাজমান থাকেন। তাঁদের একমাত্র আনন্দ এই বোধ যে, তাঁরা ঈশ্বরের সেবা করছেন। তাঁর

নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছেন — যাকে বলে কৈং কার্য। তাঁরা বেদান্তি-নদের মত অনন্তের সঙ্গে এক হতে চান না — শুধু তাঁর মত হতে চান। চির আনন্দে থাকেন। চিনি হতে চান না, চিনি খেতে চান! এখানে বোধহয় খ্রীষ্টীয় ঐশ্বরিক জগতের জীবাত্মার চিরন্তন অস্তিত্বের প্রভাব পড়েছে।

ভাগবতদের মতে যখন মুক্ত আত্মা এই স্থূল দেহ ত্যাগ করে তখন প্রথম যায় পিতৃলোকে অর্থাৎ সূর্যলোকে। সেখানে তার সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর ক্ষয়ে গিয়ে অণুপ্রমাণ হয়ে যায় — পরমাণুভূতা। এর পর আত্মা ঈশ্বরে প্রবেশ করে। প্রথম পর্যায় অনিরুদ্ধ। তারপর প্রদ্যুম্ন। এরপর সঙ্কর্ষণ। সর্বশেষে সর্বোচ্য পরমেশ্বর। তবে এ ধরনের পারলৌকিক জগতের চিন্তা ভাগবতদের আদর্শের মতই সবটা স্পষ্ট নয়। ভাগবত-পরলোক চিন্তায় ব্রহ্মবাদীয় চিন্তা ও সাংখ্য-যোগ তত্ত্ব অদ্ভুত ভাবে মিশে গেছে। তবে পরমাত্মার জগতে জীবাত্মার স্বতন্ত্র আস্তিত্বিক আনন্দময় অবস্থান ভাগবতদের একটি রহস্যময় মরমিয়া ভাব জাত।

ভাগবতদের মতে পাপ হল তাই যা ভক্তির সঙ্গে চলতে অপারগ। প্রত্যেকটি পাপই এক ধরনের কর্ম, যার ফল আছে। পাপ আছে দুধরনের — জ্ঞাত পাপ ও অজ্ঞাত পাপ। অজ্ঞাত পাপ প্রায়শ্চিত্ত করলেই দূর হয়। তবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নিষ্কামভাবে প্রায়শ্চিত্তকর্ম করে। পাপ স্খালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা হচ্ছে এমন ভাবলে চলবে না। জ্ঞাত পাপের জন্য পাপী নিষ্কাম কর্মে লিপ্ত হলেই পরমেশ্বর তাঁর পাপ নাশ করেন। এ প্রায়শ্চিত্তের তুলনা করা যেতে পারে ভাড়া করা কর্মী ও দাসের কাজের সঙ্গে। ভাড়া করা কর্মী যদি মালিকের কোন ক্ষতি করে তবে তাকে সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিতে হবে। যদি মালিকের প্রতি প্রেম-বশত কোন দাস কাজ করে, কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা না করে কাজ করে, তবে তার কাজের ত্রুটি পূরণ করেন মালিক স্বয়ং। সে ত্রুটির দায়িত্ব দাসের উপর পড়ে না। পঞ্চদশ শতকে উপরোক্ত তত্ত্বই ভাগবতদের হৃদয় আচ্ছন্ন করেছিল। এখনও যে নেই-তা নয়। এ হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তত্ত্ব। এরও পূর্বে এ ধরনের তত্ত্ব ছিল 'নারায়ণী'-তত্ত্ব হিসেবে।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ভক্তিমার্গীরা চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যেমন, (১) রামানুজ প্রতিষ্ঠিত শ্রীসম্প্রদায় (২) মধ্ব প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসম্প্রদায়। (৩) বিষ্ণুস্বামিন্ প্রতিষ্ঠিত রুদ্র সম্প্রদায় ও (৪) নিম্বাদিত্য স্থাপিত সনকাদি সম্প্রদায়।

এই যে সম্প্রদায়-সমূহ এদের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কি ? শঙ্করের বেদান্ত দর্শনের প্রতি কার কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী তার উপরই এই সম্প্রদায়-গুলির স্বতন্ত্র স্বীকৃতি। তবে ভাগবত লেখকদের মধ্যে এই যে সম্প্রদায়-ভেদ তা নিতান্তই বাহ্যিক। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে উপ-সম্প্রদায়ও আছে। কিন্তু মূল ভাগবত সম্প্রদায় থেকে কেউই বিচ্যুত নয়। বিশেষ বিশেষ ভাগবত শিক্ষকের রুচি অনুসারেই তাঁর অনুগামীদের পরিচয়।

বেদান্তবাদিনদের সঙ্গে ভাগবতীয়দের পার্থক্য কোথায় ? পার্থক্য এইখানে যে, বেদান্তবাদিনরা সত্য হিসাবে 'এক' ছাড়া 'দুই' কিছু দেখেন নি। তাদের মত 'অদ্বৈত' মত। যাঁরা এই মতবাদে বিশ্বাসী তাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন স্মার্ত বলে। স্মার্ত অর্থাৎ ঐতিহ্যানুসারী। তবে তাঁদের এই ঐতিহ্য ভাগবতীয়রা স্বীকার তো করেনই না বরং তার নিন্দা করেন। বেদান্তিন শঙ্কর হলেন মায়াবাদের উদ্ভাবক। এই মায়া-বাদেই ভাগবতীয়দের প্রচণ্ড আপত্তি। শঙ্করাচার্যপন্থীদের তারা-'মায়াবাদিন' নামে বিদ্রূপ করেন। শঙ্করাচার্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্রহ্ম—যার কোন ব্যক্তিরূপ নেই এবং কোন গুণও নেই। মায়ার প্রভাবেই তিনি অসত্য অস্তিত্বের রূপ ধরেন। জীবাত্মা হল ব্রহ্মেরই অংশ—মায়া দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে প্রতিভাসিত। ব্রহ্মে মিশলে তবেই তার স্বতন্ত্র-অস্তিত্বের অবস্থান—ব্রহ্মসঙ্গীতের ভাষায় 'শূন্যে শূন্য মিলাইল।'

সকল ভাগবতেরই এক কথা—মায়াবাদ স্বীকার্য নয়। মায়াজাত কোন ফলাফলও নয়। আসলে পরমেশ্বর হলেন—স্বভাবতই ব্যক্তি-চারিত্রিক। এই পরমেশ্বর থেকে জীবাত্মা স্বাতন্ত্রিক অস্তিত্বে নির্গত হয়ে চির-স্থায়িত্ব লাভ করে। পুনরায় আর কখনও ভগবৎ বা ঈশ্বরে লয় পায় না।

ভাগবতদের মধ্যে শ্রী সম্প্রদায় শঙ্করাচার্যের বেদান্ত-সূত্র অস্বীকার

করলেও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীতে বিশ্বাস হারায়নি। প্রাকৃত শক্তিকে তারা ব্যক্তিগত দেবতার রূপ দিয়েছিলেন। ঔপনিষদিক ব্রহ্মনকে তাঁরা এমন দেবতা হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন যার মধ্যে সবকিছুর অবস্থান। সমস্ত শুভ গুণও তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। বস্তুও যেমন এসেছে তাঁর থেকে, আত্মাও এসেছে তাঁরই থেকে। সকল কিছুর মধ্যে তিনি অন্তর্যামিন হিসেবে বিরাজ করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের উপাস্যও এক, দ্বিতীয় বিহীন। দ্বিতীয় এখানে বিশেষ অর্থে বিদ্যমান বলে এই অদ্বৈতাবস্থা হল বিশিষ্ট অদ্বৈত অবস্থা—যাকে এরা বলেন বিশিষ্টাদ্বৈত মত। এই মতবাদ নাকি ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর শক্তি—অর্থাৎ লক্ষ্মীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। লক্ষ্মীর এক নাম 'শ্রী'। সেইজন্য এই সম্প্রদায়ের নাম শ্রী সম্প্রদায়। এই তত্ত্ব স্বয়ং লক্ষ্মী শিখিয়েছিলেন বিষ্বক সেন নামে দেবতুল্য কোন ব্যক্তিকে। বিষ্বক সেন শেখান শথকোপ নামে কাউকে। এদেরই অষ্টম অধস্তন পুরুষ রামানুজ। রামানুজের সময় হল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক।

মধ্ব-এর ব্রহ্ম সম্প্রদায় ভিন্নভাবে ভাগবত ধর্ম রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি বেদান্তিন ব্রহ্মনতত্ত্ব অস্বীকার করে সাংখ্য-যোগ দর্শনের দ্বৈত-তত্ত্বে ফিরে যান। সুতরাং মধ্ব প্রবর্তিত মতবাদের নাম দ্বৈত মত। মধ্ব সম্প্রদায় শঙ্করকে বলেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। পাঁচটি চিরন্তন ভেদের কথা বলেন তাঁরা, যেমন (১) ঈশ্বর এবং জীবাত্মা (২) ঈশ্বর এবং বস্তু (৩) জীবাত্মা এবং বস্তু (৪) এক জীবাত্মা থেকে আর এক জীবাত্মা এবং (৫) এক বস্তুসাত্তিক পরমাণু থেকে অপর বস্তুসাত্তিক পরমাণু। অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্রহ্ম সম্প্রদায় সাধারণ ভাগবত বিশ্বাসে বিশ্বাসী হলেও তাঁরা সর্বোচ্চ ঈশ্বরকে ডাকেন 'বিষ্ণু' নামে—বাসুদেব বা ভগবৎ নামে নয়। মধ্বের অনুগামীরা নিজেদের পরিচয় দেন মধ্বচারী বলে। তাঁদের দাবি স্বয়ং ব্রহ্মা এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। এই মতবাদ বাহকদের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ হলেন মধ্ব। ব্রহ্মা থেকে এই মতবাদ এসেছিল বলে এই সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্ম-সম্প্রদায়। ব্রহ্মবাদীদের থেকে এই সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের জন্য শাঙ্করিক বেদান্তিনরা মধ্বকে প্রচণ্ডভাবে

আক্রমণ করেন। পাষণ্ড চপেটিকা গ্রন্থে অর্থাৎ 'পাষণ্ডের গালে চড়' নামক গ্রন্থে তারা মধ্বকে যা ইচ্ছে তাই বলেন।

ভাগবত সম্প্রদায়ের মধ্যে রুদ্র-সম্প্রদায় বেশ আধুনিক। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুস্বামিন পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকের লোক। তবে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের মতবাদকে একটু বিশেষ গুরুত্ব দেবার জন্য প্রচার করেন যে, সাড়ে চার হাজার বছর আগেও আর একবার পূর্বজন্মে বিষ্ণুস্বামি এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ঈশ্বর প্রথম প্রচার করেন রুদ্রের কাছে। রুদ্র মানুষের কাছে এই ধর্ম প্রচার করেন। শিক্ষা পরম্পরায় বিষ্ণুস্বামিন হলেন রুদ্রের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ। বিষ্ণুস্বামিন দক্ষিণ ভারতের লোক। তবে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা গুজরাটেই বেশি। বিষ্ণুস্বামিনের অন্যতম শিষ্য লক্ষ্মণ ভট্ট উত্তর ভারতে আসেন। তাঁর পুত্র বল্লভ বা বল্লভাচার্য এই সম্প্রদায়ের বিশেষ অনুগামী হন। বল্লভাচার্যের অনুগামীরা বল্লভাচারী নামে খ্যাত। এদের তত্ত্বের নাম শুদ্ধাদ্বৈত মত। তাদের মতে পরমেশ্বরের তিনটি অবস্থা —(১) সৎ, (২) চিৎ ও (৩) আনন্দ। আত্মাই উপাস্য। কিন্তু আত্মার আনন্দাবস্থা অন্তর্হিত হয়ে আছে। জড় পদার্থের মধ্যেও রয়েছে চিৎ ও আনন্দ—কিন্তু অন্তর্হিত অবস্থাতে। আত্মা মোক্ষ লাভ করে ঈশ্বরীয় স্তরে চিরকাল বিরাজ করে।

সনকাদি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য। এই সম্প্রদায়ই ভাগবত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সূর্যের এক অবতার। একবার পরমেশ্বর 'হংস অবতাররূপে' ধরাধামে আসেন। তিনি তখন সনক ও তার ভাইয়ে-দের কাছে এই তত্ত্ব প্রচার করেন। এঁরা সবাই ছিলেন ব্রহ্মার মানস পুত্র। এঁরা নারদকে এই তত্ত্ব দেন। নারদ শেখান নিম্বার্ককে। এদের তত্ত্বের নাম দ্বৈতাদ্বৈত মত। অর্থাৎ দ্বৈত ভাবাপন্ন অদ্বৈত মত। এই মতবাদের বক্তব্য হল আত্মা এবং বস্তু পরমেশ্বর থেকে ভিন্ন! তথাপি পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের সঙ্গে তা নিকট সম্পর্কে যুক্ত। সাপের যেমন

প্যাঁচ, জলের যেমন ঢেউ, ব্যাপারটা তেমনই। পরমেশ্বরকে বুদ্ধির বিচারে ধরা যাবে না। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে তার অভিব্যক্তি রয়েছে। প্রাকৃত জিনিস 'অক্ষর' এবং 'অক্ষর' শব্দ সৃষ্টি করছে। নানা ধরনের বর্ণমালা থাকলেও তাদের ধ্বনি এক। বাইরে সত্য নিয়ে যত মতপার্থক্যই থাকুক না কেন—সেটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়—যদি অদৃশ্য ঐশ্বরিক প্রেমের স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি। সনকাদি সম্প্রদায়কে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। জৈনরা এই সম্প্রদায়কে প্রায় মুছেই দিয়েছিলেন কিন্তু নিবাস নামে কেউ আবার তা প্রচার করেন।

সকল ভাগবত সম্প্রদায়ের সদস্যেরা আবার দুভাগে বিভক্ত—যাজকীয় সম্প্রদায় ও সাধারণ অনুগামী। সাধারণ মানুষ যাজকীয় সম্প্রদায়ের দিকে তাদের নির্দেশের জন্য তাকিয়ে থাকেন। তবে যাজকীয় সম্প্রদায়ের মর্যাদা এক এক শ্রেণীতে এক এক রকম। যাজকীয় সম্প্রদায়ের ভাগবতেরা অবিবাহিত থাকেন ব্রহ্মচর্য নিয়ে। বসনে ভূষণে সন্ন্যাসী। তবে রুদ্র-সম্প্রদায়ভুক্ত যাজকেরা বিয়ে করে সংসার করতে পারেন। সন্ন্যাসী ধরনের যাজকদের বলে বৈরাগী। এরা ঘুরে ঘুরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করেন। বৃদ্ধ বয়সে কোন না কোন মঠ মন্দিরে এসে আশ্রয় নেন। মঠগুলিতে মাঝে মাঝেই বৈরাগীদের জমায়েত হয়। বেশ কিছুদিন এখানে তাঁরা থাকতেও পারেন। মঠের পরিচালকের নাম—মহন্ত। এরা মঠের সম্পত্তিও দেখাশুনা করেন।

সামান্য কিছু মতপার্থক্য নিয়ে গত সাত শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে এদের দর্শন। দর্শন এই ধরনের :

শ্রী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামানুজকে তার অনুগামীরা মনে করেন শেষ নাগের অবতার বলে। রামানুজ দক্ষিণ-ভারতের লোক। অধিকাংশ সময় মাদ্রাজের কাছে কঞ্জিভেরামে থাকতেন। তত্ত্বের দিক থেকে এরা জাতপাত মানতেন না। তবে এই সম্প্রদায় প্রধানেদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ। নিচু বর্ণের লোকদের তেমন শিষ্য করেন নি। মূল সংস্থাগুলি রয়েছে দক্ষিণ-ভারতে। উত্তর-ভারতে কখনও

তেমন জনপ্রিয় নন। রামানুজ নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে বেশ কড়াকড়ি করেছিলেন।

দেখা যাচ্ছে ভাগবতেরা 'একমাত্র উপাস্যকে'ই যে আরাধ্য করেছিলেন তা নয়, তাঁর নানা অবতাররূপকেও পুজো করতেন। ঈশ্বরের অবতারের মধ্যে কে কাকে বেশি ভজনা করবেন রামানুজ সে বিষয়ে কড়াকড়ি কোন নির্দেশ দেননি। তবে শ্রীরামচন্দ্রকেই বেশি পছন্দ করতেন। এরা ভগবানের শক্তি লক্ষ্মীকেও তাঁর তুল্যই মনে করতেন। ফলে বহু রামানুজপন্থী লক্ষ্মীর অবতার রূপ পুজো করতেন।

রামানুজের অধস্তন চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষই হলেন চতুর্দশ শতাব্দীর রামানন্দ। শ্রীরঙ্গপত্তনের এক মঠের মহন্ত ছিলেন রাঘবানন্দ, তাঁর শিষ্য এই রামানন্দ। সম্প্রদায়ের নিয়ম-কানুন নিয়ে গুরুর সঙ্গে মতভেদ। তাই রামানন্দ উত্তর ভারতে এসে নিজস্ব সম্প্রদায় তৈরি করেন—যাঁরা 'রামানন্দি' নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের বিশেষ মত এই যে, বর্তমান যুগে শ্রীরামচন্দ্রই উপযুক্ত উপাস্য। রামের উপাসক বলে রামাবত্ নামে পরিচিত। রামানন্দ তাঁর বক্তব্য সংস্কৃতে প্রচার না করে লৌকিক ভাষাতে করেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষের দরবারে তাঁর বক্তব্য গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিল বেশ ভালভাবেই। তিনি সকল মানুকেই সমান মর্যাদা দিতেন। সমাজের সর্বাপেক্ষা নিচুতলার লোককেও তিনি তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত করেছিলেন। শুধু যে তারা রামানন্দি হতে পেরেছিল তাই নয়, রামানন্দি সম্প্রদায়ের তত্ত্ব প্রচার করার সুযোগও পেয়েছিল। রামানন্দিদের জন্য বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক নিয়মকানুনের কঠোরতা ছিল না। এঁরা স্নানাহারের ক্ষেত্রেও তেমন কোন বাধ্যবাধকতা তৈরি করেননি। এইজন্য এঁরা অবধূত বা মুক্ত নামে পরিচিত হয়েছিলেন। রামানন্দিপন্থিদের নানা উপ-সম্প্রদায় কবীরপন্থি, খাকি, মুলুকদাসী, রুইদাসী এবং সেনাপন্থি নানা নামে পরিচিত। রামানন্দ জাতিবর্ণ মানতেন না বলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর শিষ্য হয়েছিল। যেমন কবির মুসলমান, সেনা নাপিত, রুইদাস চামার ইত্যাদি। কবীরের

প্রচারের মধ্যে যেমন পড়েছিল খ্রীষ্টীয় প্রভাব, তেমনই ইসলামিক প্রভাব। রামকে এইজন্য তিনি বিশেষ কোন আকারের সঙ্গে যুক্ত না করে অরূপ-অনন্তের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কবীরপন্থিদের থেকে এসেছিল আরও দুটি বিখ্যাত-উপসম্প্রদায় — শিখসম্প্রদায় ও দাদুপন্থী।

তবে এই সম্প্রদায়-বিভক্তি সত্ত্বেও উত্তর ভারতে রামানন্দের মৌল দর্শনই বেশি প্রচলিত। নানা উপসম্প্রদায় মূল রামানন্দি সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করেনি। রামানন্দ সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রচারক বোধহয় সন্ত্ তুলসীদাস (ষোড়শ শতকের শেষপর্ব)। রামচন্দ্রের অবতার রূপের পূজা অন্য যে কোন প্রচারক অপেক্ষা তিনিই প্রচার করে-ছিলেন বেশি। তুলসীদাসী রামায়ণ 'রামচরিতমানস' বোধ হয় হিন্দী বলয়ের বাইবেল স্বরূপ। সকল ভাগবত সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই গ্রন্থ শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন।

তুলসীদাসের সমসাময়িক ছিলেন আরও একজন নাভা দাস বা নারায়ণ দাস। তিনি রচনা করেন 'ভক্তমাল'। ভক্তমালের প্রভাবও উত্তর ভারতে কম নয়।

ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মধ্ব বা আনন্দতীর্থ। মধ্বছিলেন শৈব। শেষ জীবনে ভাগবত ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন। কোন বিশেষ অবতারকে যে মধ্ব-উপাস্য করেছেন তা নয়। তবে উত্তর ভারতে কৃষ্ণই হয়েছেন এই সম্প্রদায়ের মুখ্য আরাধ্য। ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের 'যাজক শ্রেণী' ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়-ভুক্ত। তবে সাধারণ অনুগামীদের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোকই আছে। বঙ্গদেশের শ্রীচৈতন্য অনুগামী বৈষ্ণব সমাজ এই ব্রহ্ম সম্প্রদায়েরই একটি। ভক্তকল্পদ্রুমের মতে চৈতন্যদেব স্বয়ং ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন। তবে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের আদর্শ রুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত ভাগবতদের সঙ্গেই বেশি মিলে যায় বলে মনে হয়।

রুদ্র সম্প্রদায় বলতে এখন বোঝায় বল্লভচারীদের। এদের মূল উপাস্য ভগবান কৃষ্ণ। এখানে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি, অনুরাগ, পিতার প্রতি পুত্রের অনুরাগ নয়; নরের প্রতি নারীর অনুরাগ, কিশোরের প্রতি কিশোরীর

অনুরাগ। এর ফলে পরবর্তীকালে ধর্মের মধ্যে অনেক কামগন্ধ ঢুকে পড়ে। কৃষ্ণের মানবীসঙ্গিনী রাধাকে এখানে পুরুষোত্তমের শক্তি হিসেবে ধরা হয়। কখনও বা কেউ এই রাধাকেই ভজনা করেন, কেউ করেন কৃষ্ণকে। এই সম্প্রদায়ের যাজকেরা বিবাহ করে ঘর সংসার করেন। এই সম্প্রদায়ে সকলেই ঢুকতে পারলেও বড়লোকদের সংখ্যাই এখানে বেশি। কৃষ্ণের আরেক রূপ 'বালগোপাল' রূপ মহিলাদের খুবই প্রিয়। উত্তর ভারত ও মহারাষ্ট্রে এই গোপাল সেবার বেশ প্রচলন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই মেবারের রাণী মীরাবাঈ একটি উপসম্প্রদায় তৈরি করেন। তাঁর আরাধ্য কৃষ্ণের রূপ হোল 'কৃষ্ণ রণছোড়'।

বাংলার বৈষ্ণবেরা বোধ হয় বল্লভাচার্যপন্থিই বেশি। কারো কারো মতে বল্লভাচার্য শ্রীচৈতন্যের শ্বশুর ছিলেন। বাংলার রাধাবল্লভি অর্থাৎ যাঁরা রাধাকৃষ্ণ ভজনা করেন তাঁরা মূলত বল্লভাচারীই। তবে সম্প্রদায় হিসেবে তাদের সনকাদি সম্প্রদায়ের মধ্যেই ফেলা হয়।

সনকাদি সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বর্তমানে কম। এদের অল্পসংখ্যক অনুগামীদের দেখা যায় উত্তর ভারতে রাজপুতানায়। এরা নিমবত নামে পরিচিত। এদের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ। এই সম্প্রদায় থেকেই এসেছে বাংলা রাধাবল্লভী সম্প্রদায়। হরিবংশ বা হিত নামে কোন নিমাবত এই সম্প্রদায় স্থাপন করেছিলেন। রাধবল্লভীদের মধ্যেই অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে যৌন-তার গন্ধ বেশি করে ফুটে উঠেছে। এদের চিন্তাতে এমন দাঁড়িয়েছে যে, কৃষ্ণের শক্তি হয়েও, রাধা হয়েও রাধা যেন কৃষ্ণকেও আড়াল করে ফেলেছেন। রাধাবল্লভ হিসেবে তিনি রাধারও নিচে পড়ে গেছেন। রাধাবল্লভ থেকেই এই সম্প্রদায়ের নাম রাধাবল্লভী। কৃষ্ণপ্রেমিক রাধাই এখানে উপাসনার মূল লক্ষ্য। এদের মধ্যেই এসেছে সখীভাব সম্প্রদায় ও চরণদাসী সম্প্রদায়। এই জন্যই বোধহয় বাংলায় 'কৃষ্ণরাধা' না বলে বলা হয় 'রাধাকৃষ্ণ'।

আধুনিক ভাগবত ধর্মে গুরুর প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে। ভক্তমালের প্রথম লাইনেই আছে—ভক্তি, ভক্ত, ভগবন্ত, গুরু। অবশ্য

গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন। প্রাচীন ভারতে শিষ্যের কাছ থেকে গুরুরা নিঃশর্ত আনুগত্য দাবি করতেন। গুরু ছিলেন যেন দ্বিতীয় পিতা। এবং পিতা অপেক্ষাও তিনি অধিক শ্রদ্ধেয়। তবে শিষ্যত্ব শেষ হলেই গুরুর প্রতি আনুগত্যও শেষ হত। কেউ যদি সেটা রাখত তবে তা ছিল কৃতজ্ঞতাবশতঃ। বাধ্যবাধকতা কিছু ছিল না।

কিন্তু আধুনিক কালে গুরুর মর্যাদকে যেন আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কবীরপন্থিরা গুরু নির্বাচনে বাজিয়ে দেখতে বলেছেন, কিন্তু নির্বাচিত হলে তাঁর প্রতি সারা জীবনেও আর আনুগত্য ত্যাগ করা যাবে না এমন ফতোয়া দিয়েছেন। গুরুবাক্য ঈশ্বরবাক্য তখন সমান। উপাস্য দেবতার প্রতি যে অনুরাগ দেখানো হয় গুরুর প্রতিও সেই অনু-রাগ দেখাতে হবে। বল্লভচারীদের ভক্তি তো অবিশ্বাস্য। ভক্তেরা তাদের দেহ, আত্মা, সম্পদ সবই ঈশ্বর ও গোসাঁইকে সমর্পণ করে। গোসাঁই হলেন গুরু। গুরু তখন মানুষ নন, দেবতা। এই আনুগত্য এমন পর্যায়ে পৌঁছাতো যে ভক্তেরা নববিবাহিত পত্নীকে পর্যন্ত গুরুর ভোগের জন্য ছেড়ে দিতে ইতস্ততঃ করতেন না। ভারতে ধর্মপ্রণেতাদের দৈবীসত্তা দান এ দেশের একটি সহজাত মানসিকতা। এই মানসিকতা থেকে প্রথম ভাগবতেরা বাসুদেবকে দৈবীসত্তা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রচারকেরাও দৈবী মর্যাদা লাভ করেন।

কোন হিন্দুই যে-কোন সম্প্রদায়ের সদস্য হতে পারেন না যদি না সেই সম্প্রদায়ের গুরু তেমন অনুমতি দেন। শিষ্যকে প্রথম কৌতূহল দেখাতে হবে। গুরু যখন দেখবেন যে সে শিষ্য হবার যোগ্য তখন কানে কানে মন্ত্র দেবেন। এই মন্ত্র অত্যন্ত গোপন, শিষ্যেরা কাউকে জানাতে চান না। তবে ভাগবতদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই মন্ত্র হত 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'। রামানুজের মন্ত্র ছিল 'ওঁ রামায় নমহ্'। ভল্লবাচারীদের মন্ত্র ছিল—অষ্টাক্ষরীর 'শ্রীকৃষ্ণ শরণম্ মম'।

এক এক সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে। এই চিহ্নগুলি কপালে বা দেহের ভিন্ন অংশে পরা হয়। ভারতবর্ষের বহু হিন্দুর ললাটে

যে চিহ্ন দেখা যায় তা তাদের বিশেষ সম্প্রদায়কে বোঝাবার জন্যই। ভাগবতদের নানা ধরনের তিলক বিখ্যাত। এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামানো হয় নি। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় দেহের এমন সব স্থানে এই চিহ্ন আঁকা হয় যে সকল স্থান বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের উৎস। চৈনিক আকুপাংচার পদ্ধতিতে দেহতত্ত্ব বিচার করলে এর গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তবে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড যে বহু সূক্ষ্মদর্শনের উৎস সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং সেই পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তা খুব একটা হেলাফেলার কথা নয়।

পরবর্তীকালের ভাগবতেরাই ভক্তির চরিত্র নিয়ে বেশী মাথা ঘামিয়েছেন। নানা ভাবে তাঁরা এই ভক্তির চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। একে বলা হয় ভাব। প্রত্যেকটি ধর্মই নির্ভর করে তার স্থায়ী ভাবের উপর। এই ভাবগুলো অবশ্য নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা। এই ধরনের ভাব বা রস আছে পাঁচটি—(১) প্রশান্ত ভাব (২) দাস্য ভাব (৩) সখ্য ভাব (৪) বাৎসল্য ভাব ও (৫) রতি ভাব।

এই সব ভাবের আছে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। মূল ভাবের ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজন অবিসম্বাদিত না হলেও এই ভাবগুলোর পাশা-পাশি চলতে বাধা নেই। এই ধরনের সঞ্চারী ভাবের সংখ্যা তেত্রিশটি। এর মধ্যে আছে নির্বেদভাব অর্থাৎ পার্থিব জিনিসের প্রতি বিরক্তি। শঙ্কা ভাব, চিন্তা ভাব অর্থাৎ বেদনাদায়ক চিন্তা প্রভৃতি।

এক একটি মূল ভাব—তার সঙ্গে সঞ্চারী ভাব থাক বা না থাক—এক এক ধরনের মানসিক অবস্থা তৈরি করে। একেই বলে রস। এই রসগুলোকে সাজালে এই ভাবে উল্লেখ করা যায়। যেমন—(১) শান্তি-রস, (২) দাস্যরস (৩) সখ্য রস (৪) বাৎসল্য রস ও (৫) শৃঙ্গার বা মাধুর্য রস। শেষ রস হল রসের চূড়ান্ত, যে জন্য একে বলা হয় রসরাজ বা উজ্জ্বল রস।

প্রত্যেকটি রসের আবার রয়েছে বিভাব অর্থাৎ এক ধরনের উত্তেজক ভাব। এই বিভাব আলম্বন অর্থাৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হতে পারে—

আবার ভাব বৃদ্ধিকারকও হতে পারে। ভাব বৃদ্ধিকারক বিভাবকে বলে উদ্দীপনা। তবে এই ভাবের জন্য উদ্দীষ্ট কোন লক্ষ্য চাই, সার্বিক লক্ষ্য, যার প্রতি সর্ব মনোপ্রাণে ভাবকে উজার করে দেওয়া যায়। এ-রকম বিভাবকে বলে—বিষয়ালম্বন। এমন কোন বিভাবও হতে পারে যা 'তুলনামূলক ভাবে প্রয়োজনীয়' যেমন—আশ্রয়ালম্বন। এতে রসের উদ্রেক হয়। মূলভাবকে তখন উদ্দীষ্টের দিকে পরিচালিত না করলেও চলতে পারে। সীতাকে এরকম একটি বিভাব বলা যায় যিনি শ্রীরাম-চন্দ্রের ঘরণী বা সহধর্মিনী। সীতা এক্ষেত্রে প্রেমরসের বিভাব হতে পারেন। কারণ তিনি ভক্তের মনে মানসিক রসের উদ্রেক করেন—যার মূল শিকড় রয়েছে রতি ভাবের মধ্যে। সীতার ভালবাসা রতি ভাবেই শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হয়েছে, যদিও পরমেশ্বর হিসেবে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ংই আকর্ষণের বস্তু। বিভাবের ফলেই ফুটে উঠে কর্ম, অঙ্গভঙ্গী বা বিভাবীয় রসোজ্জ্বলতা। যেমন শ্রীরামচন্দ্রে যাঁরা শরণাগত তাঁদের মধ্যে রয়েছে দাস্য ভাব।

ভাবের রসে যখন বিশেষ আত্মিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু ফলাফলও দৃষ্টি এড়ায় না। একে বলে অনুভাব। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল সাত্ত্বিক ভাব, অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবাবেগের প্রকাশ। এই ভাব নিম্ন ধরনের (১) স্তম্ব—অর্থাৎ গতি স্তব্ধ করা, (২) কম্প—ভাবের বেগে দেহ শিহরিত হওয়া, (৩) 'স্বর ভঙ্গ' অর্থাৎ বাক্য বিঘ্নিত হওয়া (৪) বৈবর্ণ্য—দেহের রঙ বদলানো, (৫) অশ্রু—চোখের জল পড়া, (৬) স্বেদ—অর্থাৎ ঘর্মাক্ত হওয়া, (৭) পুলক, অর্থাৎ আনন্দাপ্লুত হওয়া (৮) প্রলয়, অর্থাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। অন্যান্য অনুভাবগুলিও আধ্যাত্মিক, যেমন অনুরক্তি, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি ভাগবতই এরকম বিশ্বাস করেন যে, জন্মকালেই তাঁরা কর্ম সঙ্গে নিয়ে আসেন। অর্থাৎ এ-জীবনে কি ভূমিকা তিনি পালন করবেন ঈশ্বর তা ঠিক করে দেন। ঈশ্বরনির্দিষ্ট ভূমিকা হিসেবেই কেউ হন ধর্মপ্রচারক, কেউ সাধুসন্তের সেবক, কেউ শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রোতা, কেউ গায়ক,

কেউবা সুস্থ নৈতিক গৃহী প্রভৃতি। এই যে কর্মের ভূমিকা একে বলে নিষ্ঠা। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে কেউ কেউ একাধিক নিষ্ঠাও পালন করতে পারেন। বিশ্বাস, ঈশ্বরের চব্বিশটি অবতারের অধীনে আছে উপরোক্ত ধরনের চব্বিশটি নিষ্ঠা। ভাগবত সন্তেরা তাঁদের নিষ্ঠা অনুযায়ীই বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

মধ্যযুগে ভারতে এত দ্রুত এই ভাগবত ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল যে, ভারতের ইতিহাসে এমন চমকপ্রদ ঘটনা খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, এ যেন বহিরাগত কোন ধর্ম, অকস্মাৎ ভারতে আবির্ভূত হয়ে ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এ লক্ষ্য করেই অনেকের ধারণা, ভক্তিভাবের এই ধর্ম বোধ হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে খ্রীষ্ট ধর্মেরই কোন ধরনের প্রভাবে সম্ভব হয়েছে।

ভাগবত ধর্মের উদ্ভবের যথার্থ সময় সত্যিই জানা যায় না। যে রহস্য এই ধর্মকে আচ্ছন্ন করে ছিল, আধুনিক কালেই তা অনেকটা দূর হয়েছে। অধ্যাপক গার্বে শ্রীমদ্ভগবতগীতার রচনাকাল নির্দিষ্ট করার পরই জানা গেছে যে, এই ভক্তিবাদের উদ্ভব খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবের অনেক আগে। সুতরাং একথা বলতে দ্বিধার কোন কারণই নেই যে, ভাগবত ধর্ম কোন বাইরের প্রভাবজাত ধর্ম নয়। ভারতের মৃত্তিকার প্রসাদ এই ধর্ম। তবে ভাগবত ধর্মে সংস্কার আন্দোলনের কাল ও শ্রীমদ্ভগবতগীতার কাল এক নয়। বেদান্তের মত ভাগবত ধর্মও এক সময় ক্ষত্রিয়দেরই ধর্ম ছিল। বস্তুবাদীদের মতে এরকম ধারণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন ছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসনের প্রতি প্রজাদের নিঃশর্ত আনুগত্য আদায়ের জন্য। তবে এর মধ্যে কৃত্রিমতা রয়েছে এমন প্রমাণ কিন্তু পাওয়াই যায়নি? বস্তুবাদীদের মানসিকতাই আলাদা। তাঁরা ওথেলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়-যন্ত্রের পেছনেও প্রলেতারিয়ৎ বা সর্বহারার প্রতিকার স্পৃহা দেখতে পান। এর অনৈকতার প্রশ্নকে তেমন আমল দিতে চান না বা ব্র্যাড্‌লে উদ্ভাবিত তত্ত্ব 'আত্মদ্বন্দ্বই শেকসপীয়রীয় ট্র্যাজেডির রন্ধ্র' একথা স্বীকার

করেন না। 'The Shakespearian heroes fell victims not to outside forces, but to inner contradictions they were suffering from.'

সেকথা থাক, মূল আলোচ্য বিষয়ে আসা যাক। ভাগবতধর্ম ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের যুগে সংস্কৃত ভাষাতেই প্রচারিত হয়েছিল। এবং বিদগ্ধ ক্ষত্রিয় শাসক ও অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তিরাই এই ধর্ম চর্চা করতেন। তখন ভাগবত ধর্মেও অনুষ্ঠানিকতা ছিল এবং বলি চলত। সুতরাং সম্পদশালী ব্যক্তিরাই এই ধর্ম অনুসরণ করতেন, গরীবেরা নয়।

ভাগবত ধর্মানুষ্ঠানের যা-সব নিয়মকানুন আছে তা সত্যি ব্যয়বহুল। সেক্ষেত্রে শৈব ধর্মানুষ্ঠান প্রায় ব্যয়হীন। বিষ্ণুর সঙ্গে যুক্ত হবার পর ভাগবত ধর্ম সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে নিশ্চয়ই চলে গিয়েছিল। সেই অর্থে আদিতে এই ধর্ম নিশ্চয়ই লৌকিক ধর্ম ছিল না। বৈদিক ব্রহ্মন-বাদের সঙ্গে যুক্ত হবার পর এর আড়ম্বর আরও বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এর যোগাযোগ সেই কারণেই কম ছিল। আসলে সাধারণ মানুষের 'অধ্যাত্ম আদর্শ' ব্রহ্মে লীন হবার মধ্যে নেই। তারা চায় স্বর্গসুখ। সুতরাং আদিকালে এবং খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পরেও বেশ কিছু দিন সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ক্ষুধা মিটিয়েছে সীমান্ত প্রদেশাগত বৌদ্ধ ধর্ম এবং শৈব ধর্ম। শৈব ধর্ম তারাই বেশি পছন্দ করতেন যাঁরা ব্যক্তিগত কোন ঈশ্বর কামনা করতেন। সুতরাং আদি ভাগবত ধর্মানুরাগীদের সংখ্যা দিনকে দিন কমেই যাচ্ছিল। এবং শঙ্করা-চার্যের আবির্ভাবের পর একরকম ডুবে গিয়েছিল বললেই চলে। এতটাই এই ধর্ম ডুবে গিয়েছিল যে, সমকালীন সাহিত্যে 'ভক্তি' শব্দটির উল্লেখই প্রায় নেই। শঙ্করাচার্য স্বয়ং তাঁর দর্শন গ্রন্থে একবার মাত্র 'ভক্তি' শব্দটির উল্লেখ করেছেন। শুধু দক্ষিণ ভারতে টিমটিম করে ভাগবতধর্মের সলতে জ্বলছিল। এবং এ ধর্মের নবজাগরণও ঘটেছিল দক্ষিণ ভারতেই। যাঁরা ঘটিয়েছিলেন তাঁদের কথা আগেই বলেছি। রামানন্দের আবির্ভাবের অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই এই ধর্ম ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে রূপান্তরিত হয়।

প্লেটোর সঙ্গে সেণ্ট পলের মানসিকতার ফারাকের মত একেশ্বরবাদীয় ধারণাতে শ্রীমদ্ভগবতগীতা ও রামানন্দের চিন্তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রামানন্দের পরই এই ধর্ম সমাজের নিচুতলার মানুষেরও ধর্ম হিসেবে গণ্য হয়। এই ধর্ম প্রচারের মাধ্যমও সংস্কৃতের আভিজাত্যের দুয়ার ভেঙে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় নেমে আসে। এর পর ভাগবতধর্মের যে বন্যা নামে সে বন্যা বৌদ্ধধর্মের বন্যার চাইতেও অনেক প্রবল। ধর্ম তার জ্ঞানের পোশাক ছেড়ে দেয়। তখন ধর্মের আবরণ হয় আবেগ। এর মধ্যে এমন মরমিয়া চরমানন্দের সুর ফুটে উঠে—যার শিক্ষক বারাণসীতে নয়, সাধারণ মানুষের ঘরে আবেগজড়িত সাধারণ কবির মধ্যে পাওয়া যায়।

ভাগবত ধর্মের এই যে সংস্কার আন্দোলন, তার আদি পর্বে এই ধর্মের প্রচারকেরা ঘুরতেন অধ্যাত্মতার গজদন্ত মিনারে অধিষ্ঠিত দার্শনিকদের দরবারে। তাঁরা নিজেরাও পছন্দ করতেন সেই পরিবেশ। তবে গরুড় পাখির মত যত উচ্চেই তা ঘুরুক না কেন, সেই পাখির ডানাতে ছিল সাধারণের মর্মক্ষত দূরকারী অমৃত। সেই অমৃতই ঝরে পড়ে সাধারণ মানুষের উপর। দারিদ্র্যপীড়িত অসংখ্য পরিব্রাজক ভাগবত ভিখারীতে উত্তর ভারতের প্রান্তর ভরে যায়। এই দারিদ্র্যের মধ্যেও তাদের ছিল নিষ্কলুষতার ঔজ্জ্বল্য। দিব্যদর্শন, ভাবাচ্ছন্নতা, উচ্ছ্বাস, অতীন্দ্রিয় ঘটনা এসব নিয়ে যেন বিদ্যুৎচমকের মত চম্‌কে যায় ভারতবর্ষ।

ভাবের উচ্ছ্বাস প্লাবনের মত ভাসিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে। ধনীরা তাঁদের সমগ্র সম্পদ দান করেন গরীবদের। দরিদ্রতম ব্যক্তিও তার শেষ সম্বলটুকু বিলিয়ে দিয়ে ভক্তির উজ্জ্বল শিখাকে আরো দীপ্তিময় করে তোলে। শুধু যে পুরুষরাই এই আন্দোলনে নেমে পড়েন তা নয়, নেমে পড়েন মহিলারাও। উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত অধ্যাত্ম আকাশে ভেসে ওঠেন মেবারের রাজমহিষী মীরাবাঈ, কাষ্ঠ-সংগ্রাহকের স্ত্রী বক্কা, সাধ্বী সুরসুরি, ওর্চ্ছার রানী গণেশ দেরান, দিল্লীর অনুতপ্তা মগদালেন যিনি তাঁর জীবন ও নৃত্য সমর্পণ করেন পরমেশ্বরের পাদপদ্মে, এবং আরও কত!

পুরুষের মধ্যে এলেন মধুকণ্ঠ হরিদাস, যাঁর গান শোনার জন্য বাদশা আকবর পর্যন্ত সাধারণের ছদ্মবেশে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর পর্ণকুটীরে। এলেন ভক্তিগীতি রচয়িতা নন্দদাস—যাঁর শেষ বাসনা ছিল মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা যেন দয়াল প্রভুর সান্নিধ্যে আসতে পারে। এলেন বর্বর গণ্ড-প্রচারক চতুর্ভুজ। এলেন অসীম নিগ্রহসহী গোপাল। এলেন কামিনীভোগী বিল্বমঙ্গল। এলেন আগ্রার অন্ধ চারণকবি সূরদাস, এলেন রামচরিত মানস রচয়িতা সন্ত্ তুলসীদাস।

যে আবেগের বন্যায় রামানন্দ একদিন ভাসিয়েছিলেন উত্তর ভারত, প্রশ্ন, সেই আবেগের সূত্র তিনি পেলেন কোথায়? খ্রীষ্টের বিশ্বাস কি ভক্তি হয়েছে ভারতবর্ষে? না। ভক্তি ভারতবর্ষের অন্তরের সুর, প্রাচীন বৈদিক যুগ পর্যন্ত ঠেলে দেওয়া যেতে পারে ভাগবত একেশ্বরবাদের ধারণাকে। যদি কিছু এসে থাকে সেটা আসতে পারে অনেক অনেক পরে, খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হবারও বহুদিন বাদে।

খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে এসেছিল নেস্টোরিয়ান খ্রীষ্টান ও ইহুদীরা। সেই খ্রীষ্টানরা আজও রয়ে গেছে। সেখান থেকে যায় মাদ্রাজে। শোনা যায় প্রচারক টমাস নাকি উত্তর পশ্চিম ভারতে ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন। এসেছিলেন কিনা জানি না, তবে এটা ঠিক যে, খ্রীষ্টধর্ম—উদ্ভবের কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে আশেপাশের এশিয়া ভূখণ্ডের নানা স্থানেই ছিল। জলপথ ও স্থলপথ উভয় পথেই পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সেই প্রাচীন কাল থেকেই যোগাযোগ ছিল ভারতবর্ষের। ৬ষ্ঠ শতকে উত্তর-পশ্চিমে বারবারই ভারত আক্রান্ত হয়েছে এতদঞ্চলীয় আক্রমণকারীদের হাতে। দেখা যায় খ্রীষ্টীয় ৬৩৯ অব্দে কনৌজরাজ শিলাদিত্য (হর্ষবর্ধন)—যিনি ভাগবত ধর্মের সমর্থক ছিলেন, সিরিয় খ্রীষ্টানদের একটি দলকে দরবারে গ্রহণ করেছেন—যে দলের নেতৃত্বে ছিলেন অলোপেন (Alopen)। দবিস্তানের লেখক দাবি করেছেন যে, ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভারতে তিনি হিন্দু, ইহুদী, মগী (Magians) নাজারিয়ান (খ্রীষ্টান) ও মুসলমানদের সহাবস্থান দেখেছিলেন। বেদ

সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যে-কোন ব্যক্তিই এই গ্রন্থসমূহ থেকে নিজ ধর্মের পক্ষে তর্কের অবসর খুঁজে পেতে পারেন—তা সে ধর্ম হিন্দুধর্ম হোক, ইহুদীধর্ম হোক, জরথুস্ত্রবাদী ধর্মই হোক, সিয়া বা সুন্নি মুসলমানদেরই হোক।

আগের খ্রীষ্টানদের ভারত আগমন সে কারণেই হোক, ষোড়শ শতাব্দীতে জেসুইটরা যে এসেছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং বাদশা আকবরের দরবারেই এসে পেঁছায় তারা। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাজাহান ক্ষমতায় আসা অবধি আগ্রা, দিল্লী এবং লাহোরে তাদের গীর্জাও ছিল। দিল্লীর গীর্জা তো টিকে ছিল নাদির শা ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করা পর্যন্ত। সুতরাং বলা যায় খ্রীষ্টাব্দের শুরু থেকেই ভারতের মাটিতে খ্রীষ্টানদেরও উপস্থিতি ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ, সর্বত্রই খ্রীষ্টানদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সব পথই খোলা ছিল হিন্দুদের জন্য। তাদের ধর্মের সঙ্গে এ সময় ভারতের আত্মিক পরিচয় হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

বাইবেলের বক্তব্যের সঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদগীতার শেষাংশের বক্তব্যের মধ্যে বহু মিল থাকলেও একথা ভাবার যুক্তি নেই যে, বাইবেল দ্বারা শ্রীমদ্ভগবতগীতা প্রভাবিত। মহাভারতের শেষের দিকের একটি অংশ মনে হয় যিশুখ্রীষ্টের প্রায় তিনশত বৎসর পরে রচিত হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে তিনজন ঋষি 'শ্বেত মহাদেশে' গিয়েছিলেন। সেখানে লোকেদের বর্ণ ফরসা। তারা ভক্তি ভাবে আচ্ছন্ন, যে 'ভক্তি' ভারতে নেই। তাঁদের প্রার্থনা পদ্ধতির এমন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, খ্রীষ্টান প্রার্থনা পদ্ধতির কথা মনে পড়ে। মনে হয় এই পর্যটন ক্ষেত্র ছিল হিন্দুকুশের উত্তরে এশিয়ারই কোন ভূখণ্ড। মহাভারতের শেষের দিকে এমন সব বক্তব্য আছে যাতে খ্রীষ্টান প্রভাব তার উপর পড়েনি এমন ভাবটাই কষ্টকর ব্যাপার। সেণ্ট জন কথিত সুসমাচারের সঙ্গে তার বেশ মিল আছে। মহাভারতে এক জায়গায় কৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি জন্মরহিত (শাশ্বত) ও প্রবীণতম। ঈশ্বরের একমাত্র

পুত্র, কুমারীজাত, এবং ঈশ্বরেরই অংশ। তিনি স্বীয় গোষ্ঠীর পরিচালক নিষ্পাপ দেবতা, বিশ্বেশ্বর। তিনি স্বজাতীয়দের এবং নিজের মৃত্যুকে ঋষি-বাক্য রক্ষার জন্যই অনুমোদন করেছিলেন। আরও চমকপ্রদ ঘটনা যেটা লক্ষ্য করার বিষয় সেটা এই যে, বালকৃষ্ণকে দেওয়া হয়েছিল দেবত্বের মর্যাদা। এর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন এক ধর্মপ্রচারক ও যোদ্ধা। তাঁর শিশুকাল সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা বলা হয়েছে চিরাচরিত ধারা অনুসরণ করে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সেই শিশুকৃষ্ণের বহু কাজকে অলৌকিক বলে বর্ণনা করা হয়। মথুরায় তাঁর কৈশোরের পশুচারক হিসাবে ভূমিকা—রহস্য ও বীর গাথায় জড়িয়ে যায়। গোকুলের রাখাল বালক উপাস্য দেবতায় পরিণত হন। তার জননী দেবকী—এ পর্যন্ত যিনি আড়ালেই ছিলেন, খ্রীষ্টকে স্তন্য পান করানো ম্যাডোনার মত অকস্মাৎ তিনি হয়ে যান মহিয়সী রাণী। যিশুর জন্মের মতই তাঁর জন্মকাল নিরপরাধ শিশুহত্যার কাহিনীতে ভরে ওঠে। যিশুরই মত তিনি কারো অন্ধত্ব দূর করেন, কারো বা মৃত পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দেন, কোন বিকলাঙ্গকে নিরাময় করেন ইত্যাদি। সেই জন্য কেনেডি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, খ্রীষ্টীয় কাহিনী গঙ্গা-যমুনা দোয়ারে ঢুকে গেছে। ঢুকিয়েছে উত্তর পশ্চিম থেকে আগত গূর্জরেরা। তবে এ ধরনের মন্তব্য কতটা সত্য, তা নিয়ে মতভেদ আছেই। কিন্তু কৃষ্ণের জন্মোৎসব পালনের যে পুরানো প্রথা তা লক্ষ্য করলে কিন্তু সহজে উপরোক্ত চিন্তাকে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। এই জন্মোৎসব ব্যাপারটি কৃষ্ণ কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সব যেন কেমন বদলে যায়। সেণ্ট মথি ও লুক কথিত সুসমাচারের বর্ণনার প্রথম অংশের সঙ্গে তা অপূর্ব ভাবে যেন একরকম।[১]

বল্লভাচার্য শিশু বা বালকৃষ্ণ ভজনার নমুনা মথুরা অঞ্চলে পেয়ে যান। নিজের কৃষ্ণ ভক্তির প্রয়োজনে একে তিনি কাজে লাগান।

রাম-ধর্ম এ ব্যাপারে আর এক দিকের উন্মোচন। রামকে অবতার

১. Jou:nal of the Royal Asiatic Society—1907, Kennedy, p. 95.

করে পূজা করার সূত্রপাত রামানুজ থেকে। উত্তর ভারতে তাঁর প্রচার রামানন্দের মাধ্যমে। রামানন্দের সময় মাদ্রাজের খ্রীষ্টানরা অনেকটাই স্বধর্মচ্যুত হয়েছিল। তবে প্রতীক হিসাবে খ্রীষ্টের স্বদেহ ও রক্ত দানের ব্যাপারটিকে অনুষ্ঠান করে রেখে দিয়েছিল — রুটি ও রক্ত। তাদের অনুষ্ঠান পদ্ধতি এমন এক পর্যায়ে চলে এসেছিল যাকে বলা যায় অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক খ্রীষ্টীয়। রামানুজ যে এই খ্রীষ্টানদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন তা অস্বীকার করা যায় না। খ্রীষ্টীয় 'বিশ্বাস' ও ভারতীয় ভক্তি এতই সমার্থবোধক যে, তারা কাছাকাছি এসে একে অপরকে প্রভাবিত করেনি এমন ভাবাই যায়না। হিন্দুত্বের প্রভাব যা খ্রীষ্ট ধর্মের উপর পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে খ্রীষ্টীয় প্রভাব হিন্দু সংস্কৃতির উপর পড়েনি এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় অসম্ভব। রামানুজ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত মাদ্রাজের খ্রীষ্টানদের পাশেই কাটিয়েছেন ভারতে এমন বিশ্বাস প্রবল। রামানুজ প্রথমে ছিলেন বৈদান্তিক। এখানেই তিনি ভাগবত ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হন — সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রভাবেই। এইজন্যই বোধহয় তাঁকে যথেষ্ট নিপীড়নও সহ্য করতে হয়েছিল।[১] শেষ পর্যন্ত রামানুজকে কঞ্জিভেরাম থেকে পালাতেও হয়। খ্রীষ্টানরা যেমন নিপীড়নের মধ্য দিয়ে জনচিত্ত জয় করেছিলেন রামানুজও বোধহয় সেইভাবে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে ভারতের বিরাট অংশে অল্পদিনের মধ্যেই ভাগবত ধর্ম প্রচারিত হয়। ভাগবতদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে — আঞ্চলিক এক একটা গণ্ডির মধ্যেই আটকে থাকত। শুধু বল্লভাচার্য ও হরিবংশ প্রচারিত ভাগবত রীতিই ক্ষুদ্র সীমানার গণ্ডি পার হয়ে বৃহত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে শ্রী সম্প্রদায়ের কথা ভিন্ন। এদের মধ্যে একটা আন্তবেগ ছিল — যে বেগ অল্পদিনের মধ্যেই কন্যা-

১ রামানুজের মত মধ্বও খ্রীষ্টীয় ধর্মের পরিমণ্ডলের মধ্যে ছিলেন। উভয়েই বৈদান্তিক থেকে ভাগবত হয়েছিলেন। মধ্ব ছিলেন খ্রীষ্টান অধ্যুষিত কল্যাণের কাছে উদিপির লোক। এখানে পুরানো একটা খ্রীষ্টান সংগঠন (Bishopric)-ও ছিল।

কুমারী থেমে হিমালয় পর্যন্ত তাদের বাণী ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। শ্রী সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব এই যে—এঁরা ব্যক্তিগত উপাস্য দেবতার আমদানী করেন। এঁদের ক্ষেত্রে এই উপাস্য দেবতা হয়েছিলেন পরম পুরুষের অবতার—শ্রীরামচন্দ্র।

অন্যান্য ভাগবত সম্প্রদায়েও যে ভক্তির অভাব আছে তা নয়। তবে তারা শ্রী সম্প্রদায়ের মত অত ব্যাপক পরিধিতে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি কখনও। শ্রীরামচন্দ্রের অদ্ভুত ব্যক্তি-জীবনই যে বহুলোককে আকর্ষণ করতে পেরেছিল সন্দেহ নেই। তাঁকে শেষ পর্যন্ত যে সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয় মহাকাব্যে যথার্থ সেরকম ছিল না। যা-ই হোক শ্রী সম্প্রদায়ের এই অবিশ্বাস্য বিকাশের পেছনে বোধহয় এই ধর্মের উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবই ছিল—যে-প্রভাবের ফলেই শ্রীরামচন্দ্রের মৌলিক চরিত্রে পরিবর্তন ঘটে যায়। যে-পরিবর্তনের সুর রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দে' লক্ষ্য করা যাবে সব থেকে বেশি করে। শ্রীরামের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন :—

> "কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
> কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
> ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো।
> মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
> সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
> কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
> কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
> সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম,—
> কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তার পুণ্য নাম।"
> নারদ কহিলা ধীরে 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম'।

এই সে মহান চরিত্র সেই চরিত্র প্রেমের দেবতায় পরিণত হলেন। তাঁর প্রেম হল পুত্রের জন্য পিতার প্রেম—বল্লভাচার্য ও হরিবংশের মত নারীর জন্য নরের প্রেম নয়।

ভাগবত ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় আরও একটি জিনিষ—যার নাম মহাপ্রসাদ। খ্রীষ্টধর্মে এইই হল 'sacramental meal'. এ ধরনের প্রসাদের ব্যবস্থা অন্যান্য ধর্মেও আছে। তবে শ্রীসম্প্রদায়ের এই প্রসাদ খ্রীষ্টানদের Eueharist[১]-এর মত—যেখানে যিশুর মাংস ও রক্ত হিসেবে ব্রেড এণ্ড ওয়াইনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই পবিত্র প্রসাদের কিছুটা রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য রেখে দেওয়া হয়। ভাগবতেরা সমপংক্তিতে বসে সপ্রেমে প্রসাদ ভক্ষণ করেন। এই সমতার প্রতীক আজও উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দিরে সমপংক্তি ভোজনের মধ্যে রয়েছে—যেখানে আদ্বিজ চণ্ডাল সকলেই একত্র বসে ভোজন করেন। শিখদের লঙরখানাও এই একই পর্যায়ে পড়ে।

খ্রীষ্টীয় প্রভাব ভাগবত ধর্মে অনুষ্ঠানের উপর যতটা না রয়েছে, তার চেয়ে বেশি রয়েছে সাহিত্যের ভেতর। রামানন্দ শিষ্য কবীর যে ভাবে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন তা সেন্ট জনের সুসমাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাগবতদের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ হল ভক্তমাল। তাতেও সুসমাচারীয় প্রভাব লক্ষ্য করার মত।

অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন কাহিনীর এমনই পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে যে, অবাক হয়ে লক্ষ্য করতে হয়। খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় ইতিহাসের কথা তখন স্মরণে আসতে বাধ্য। মহাভারতে দেখা যাচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের চরণ ধুইয়ে দিচ্ছেন। ভক্তমালে এরই রূপান্তর দেখতে পাই অবতার হয়েও শ্রীরামচন্দ্র শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিচ্ছেন? কোথাও দেখা যাচ্ছে অপরিচিত নগণ্য ব্যক্তিকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হচ্ছে কারণ এরাও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রেরই সমান। বলা হচ্ছে যে, বিশ্বাস থাকলে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটা যায়।

খ্রীষ্টীয় প্রভাব ভাগবতধর্মের উপর লক্ষ্য করা গেলেও তা এমন নয়

---

১. Eucharist—a Roman catholic sarament (religious rite) renewing Christ's propitiatory sacrifice of his body and blood. Bread and wine symbolise this.

যে সর্বক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব পড়েছে। প্রাচীন কালেই সমুদ্র-পথে বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল। তখন কোন্ দেশের প্রভাব ভারতের উপর পড়েছে। আর ভারতের প্রভাব কার উপর কতটা যাচ্ছে তা স্পষ্ট করে বলা দুষ্কর। ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ক্ষেত্রে শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই যে 'ঈশ্বর' শব্দের প্রয়োগ করেছেন তা গ্রীকদের Kiptos শব্দের অনুরূপ। খ্রীষ্টান ধর্মের চিন্তার সঙ্গে এক্ষেত্রে মিলে যাবার ব্যাপারটা হয়ত একটা আকস্মিক ব্যাপার। আদি খ্রীষ্টধর্মে ধর্মপ্রচারকের উপর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। ভাগবতী সম্প্রদায়ে গুরুর উপর শ্রদ্ধা অপরিসীম। গুরুকে 'ভগবন্' বলে সম্বোধন করা হত। ঈশ্বরের নামের মধ্যেই অদ্ভুত এক মরমিয়া রহস্য রয়েছে এটা উভয় ধর্মের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করার বিষয়। বাইবেলের বাক্য সম্পর্কে সৎ সন্ত্ খ্রীষ্টানদের যে বক্তব্য তা হল 'পবিত্র বাক্য, সহজে পড়া যায়, সহজে মনে রাখা যায়। চিন্তা করেও সুখ।'[১] তুলসীদাস রাম সম্পর্কে বলেছেন, 'দুটি অক্ষরের মধ্যে রয়েছে যেন আত্মার দুটি চোখ। সহজেই স্মরণ করা যায়। এই নাম সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করে। রাম নামে ইহকালে লাভ, পরকালেও সুখ।' দুই ধর্মেই তাদের ধর্মের তুলনামূলক মূল্যের কথা বলা হয়েছে।

ভারতবর্ষে পাপ সম্পর্কিত বোধের যে পরিবর্তন তা অবাক হয়ে লক্ষ্য করার মত। রামানুজের সময় পর্যন্ত পাপ অর্থ ছিল শাস্ত্রবাক্য বিরুদ্ধতা। এ ধরনের পাপের ফল জীব এড়াতে পারে না। শাণ্ডিল্যের বক্তব্যের মতে এই পাপ হল তাই—যা প্রেমের ঠাকুরের সঙ্গে সমতালে চলতে পারে না। ভাল কাজও যদি ভক্তি সহকারে না করা হয় তা পাপেরই সামিল। খ্রীষ্টানদের পাপ-চিন্তার সঙ্গে এ ধরনের পাপ-চিন্তার বেশ মিল আছে।

ভক্তির স্বরূপ যদি বুঝতে হয় তাহলে বোধহয় সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসও একটু জানতে হবে। একাদশ শতকের সূত্রপাতেই মামুদ গজনী ভারতে হানা দিতে শুরু করেন। সতেরবার তিনি ভারত

১. Thomas a Kempis.

মৃত্তিকায় হানা দেন। এরপর আসে ঘুরীরা। একের পর এক মুসলিম রাজবংশ ভারত শাসন করে। অবশেষে ১৩৩৮ খ্রীঃ তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করে এমন আঘাত হানেন যে ভারতবর্ষ কাঁপতে থাকে। এর পর থেকে সম্রাট আকবর ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত হিন্দুরা আর কখনও শান্তি বা সুখ কাকে বলে তা জানতে পারেনি। আকবরের সময় সামান্য স্বস্তি মিললেও এক শতাব্দী পরেই সম্রাট আওরঙ্গজেব এসে আবার হিন্দু-নিপীড়ন শুরু করেন। পাঁচশ বছরেরও বেশি সময় হিন্দু-ভারত মুসলিম শাসকদের নিষ্পেষণে রক্তাক্ত হয়ে যায়। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিই ঈশ্বরের দিকে তাকাতে মানুষকে বাধ্য করে। মানুষ শান্তি খুঁজে পায় ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি যোগের মধ্যে। ব্যক্তিগত প্রেমিক দেবতার উদ্ভব হয়। এ জন্য কোন খ্রীষ্টীয় প্রভাবের প্রয়োজন ছিল এটা সত্য নাও হতে পারে।

একথা সত্য যে, প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় জগতের যোগাযোগ ছিল। খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রথম দিকেই ভারতবর্ষে এসেছিল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা। রাজদরবারে তাদের গ্রহণও করা হয়েছিল। হতে পারে যে প্রাচীন ভারতীয়েরা ব্যাকট্রিয় খ্রীষ্টান ও মধ্য এশীয় খ্রীষ্টানদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এ ধর্মকে তাঁরা শ্রদ্ধাও করতেন। খ্রীষ্টানরা যে ভক্তি-প্লুত, ভারতীয়েরা একথাও স্বীকার করেছিলেন। এবং তাঁদের মতে এ-ভক্তি ভারতীয়দের ভক্তি অপেক্ষাও বেশি ছিল। বালকৃষ্ণের পূজা হয়তো বালখ্রীষ্টের অনুকরণেই এদেশে প্রচলিত হয়েছিল। এসেছিল উত্তর পশ্চিম থেকে। কৃষ্ণের জন্মোৎসবে নিশ্চিতই খ্রীষ্টীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে দক্ষিণ ভারতে এ খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব যতটা পড়েছিল উত্তর ভারতে ততটা পড়েনি। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও ঈশ্বরভক্তি ভারতে অনুপস্থিত না থাকলেও হয়তো খ্রীষ্টীয় প্রভাবে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষ করে মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতে যে এর প্রভাব পড়েছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাদের ভক্তি, তাদের বিশ্বাস হয়তো বিদেশী শাসকদের নিপীড়নে নাভিশ্বাস ওঠা ভারতীয়দের কাছে অমৃত বর্ষণের

মত মনে হয়েছিল। এ জন্য প্রভাব পড়াতো সম্ভবই! হয়তো খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের আদর্শ নতুন করে ভারতীয়দের তাদের প্রাচীন বিশ্বাস ও ভালবাসাকে জিইয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। খ্রীষ্টানদের নিবিড় বিশ্বাস, সরলতা ও নিষ্ঠা তো অস্বীকার করার মত নয়! তবু ভারতের এই ভক্তি, ঈশ্বরপ্রেম, এ যে বিদেশীদের কাছ থেকে নেওয়া তা নয়। বৃষ্টির ধারায় মত বিদেশী প্রভাব তাকে নবজীবন রসে সিঞ্চিত করেছিল হয়তো। কিন্তু প্রাণরস ছিল এদেশের মাটিতেই।

ভাগবত ধর্মের সে সমন্বয়ীভাব তা যে খ্রীষ্টানদের কাছে এসেই শেষ হয়েছে, তা নয়। ইসলামের সঙ্গেও সে সখ্যতা করেছিল। ভাগবত ধর্মে অনেক মুসলমানও প্রবেশ করেন। তাঁদের হাত ধরে আসে সুফী মতবাদ। তর্ক হতে পারে যে, এই সুফী মতবাদ মূলত ইসলামিক মতবাদ নয়। জরথুস্ত্রবাদেরই উদ্গত শাখা মাত্র।[১] তবু ইসলামের অঙ্গেই যে সে লালিত হয়েছে যে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারো কারো মতে সুফীবাদও খ্রীষ্টীয় মরমিয়াবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন। সুফীবাদের ঐশ্বরিক প্রেমের যে ধারণা তা খ্রীষ্টীয় ভক্ত সম্প্রদায়ের ধারণার মত। সে যাই হোক যে সকল ভাগবত ধর্মগুরু একসময় ইসলামিক পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন তাঁদের উপর ইসলামিক প্রভাব পড়তেও পারে। তবে সুফীবাদ উত্তর ভারতে এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত ভাগবত ধর্মকে প্রভাবিত করতে পারেনি। আশ্চর্য! দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে এর পরিচয় যেন অত্যন্তই সামান্য। সে যাই হোক, ভাগবত ধর্মে যদি ইসলামিক সুফীবাদের প্রভাব এসেই থাকে সে জন্য আপত্তি করার তো কিছু নেই। কারণ ভারত কখনও বলেনি যে, বাহির তার কাছে অচ্ছুৎ। সত্য যেখানে আছে তার কাছে হাত পাততে ভারতের কোন দিনই কুণ্ঠা হয় নি। তাই তো ভারতীয় কবি বিশ্বকবি হয়ে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাতে পেরেছেন :

১. সুফী গাথা—যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার।"

ভারতবর্ষে ধর্ম তো একটি নয় বহু। যে-সব ধর্মে কোন ব্যক্তিগত ঈশ্বর আছেন সেখানেই ভক্তি আছে। প্রত্যেকেরই কাছে তার ঈশ্বর ভগবান অর্থাৎ ভগবৎ। সেই অর্থে প্রত্যেকের ধর্মই ভাগবত ধর্ম। যাঁরা ভগবতের শক্তিকে পূজা করেন তাঁরা শক্তিকে ডাকেন ভগবতী বলে। ঈশ্বরের শক্তির উপাসকেরা শাক্ত। কিছু কিছু দেবীর স্বতন্ত্র লৌকিক উদ্ভাবনা থাকলেও কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ দেবতার সঙ্গে পত্নী, আত্মজা ইত্যাদি রূপে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই শক্তি উপাসকেরাও শক্তিকে মা হিসেবে দেখে তাঁর কাছে সন্তান হিসেবে আর্তি রাখেন। আবার যাঁরা ভারতীয় বেদান্ত ধর্মের ব্রহ্মনকে অনুসরণীয় করেছেন তাঁরাও নানা ভাবে সেই তত্ত্বকে ভাষার মারপ্যাঁচে গোপন করে মায়ের ভজনা করেন। এমন অদ্ভুত সব তত্ত্ব সাধক কবি রামপ্রসাদের গানে, কমলাকান্তের গানে, রসিকচন্দ্রের গানে প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি ব্রহ্মবাদীরাও অরূপ ব্রহ্মনকে সপ্রেমে আহ্বান করেছেন। ব্রাহ্মদের ব্রহ্মসঙ্গীত সেই প্রেমের ভিয়ানেই জড়ানো। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজেও কীর্তন চালু করেছিলেন! রাবীন্দ্রিক ঔপনিষদিক ভাব সঙ্গীতে মধুর হয়ে উঠেছে, যেন প্রেমিকার বা প্রেমিকের গান প্রেমিক বা প্রেমিকার প্রতি উৎসর্গিকৃত হয়েছে। এই সঙ্গীত-ভাবনার অবসর না দিয়েই অদ্ভুত এক বিশ্বছান্দিক নৃত্যে চিরন্তনের সৃষ্টি-লীলার মধ্যে আর্তজনকে স্থাপন করে। সেই জন্যই ভগবৎ প্রেমে উন্মাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তনের সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্রই, যত বড় মহান আধ্যাত্মিক তত্ত্বই হোক না কেন ঈশ্বর তাকে প্রেমের আকর্ষণের বৃত্তের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। প্রেম না হলে সে পরমেশ্বরের সঙ্গে সরাসরি যোগ সাধন করা যায় না! এই কারণেই ভয়াবহ বলি-প্রিয়া শাক্তদেবী ভয়ঙ্করী রূপা ৺কালীও স্নেহরূপা জননীতে পরিণত হন।

বাঙ্গালীর মত কোমল জাতের মানুষ এই কারণেই ৺কালীকেই তার হৃদয়ের মূল আরাধ্যা দেবী করেছে। বাংলার ধর্মীয় পরিচয় হয়েছে ব্রহ্ম-যামলের বক্তব্য অনুসারে "কালিকা বঙ্গদেশে চ।"

শৈব ধর্ম আদিতে ছিল ভয়ঙ্কর। কিন্তু দক্ষিণ ভারতেই এই ধর্মের নানা সম্প্রদায় সেই ভয়ঙ্করের দেবতাকে ভক্তিতে ভিজিয়ে নিয়েছিল। দক্ষিণের ভাগবত ধর্ম যখন উত্তর ভারতে ব্রহ্মবাদীয় চিন্তায় সিক্ত হয়ে উঠেছিল সেই সময় দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তিস্বভাব একেশ্বরবাদীয়রা শৈব-ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন। শিব হয়ে ওঠেন প্রেমের দেবতা, ভক্তি অর্পণের দেবতা। বিষ্ণুর নানা অবতারের মত শিবেরও অবতার রূপ দেখা দেয় যেমন বীরভদ্র। শঙ্করের মত বৈদান্তিক, মায়াবাদিনও এক সময় শিবের অবতার হিসেবে প্রতিভাত হন। ভাগবতদের বিশ্বাস, জগৎ যখন বৌদ্ধ-ধর্মের প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে তখন 'ভগবান' শিবকে অবতার হিসেবে পৃথিবীতে গিয়ে এমন একটি মিথ্যে তত্ত্ব প্রচার করতে বলেন, যাতে বিপথ-গামীরা অর্থাৎ বৌদ্ধরা বৌদ্ধধর্ম থেকে সরে আসেন। শিব শঙ্করাচার্যরূপে অবতার হয়ে সেই মিথ্যা তত্ত্ব অর্থাৎ মায়াতত্ত্ব প্রচার করে বৌদ্ধদের তাঁর বেদান্ত তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধদের হাত থেকে এই ভাবে ভগবান জগৎকে রক্ষা করেছিলেন।

সিত্তর (Sittars) নামে একটি তামিল শৈব সম্প্রদায় আছে যাঁরা চূড়ান্ত রকমে একেশ্বরবাদী। তাঁদের বক্তব্য—"ঈশ্বর এবং প্রেম একই জিনিস।"[১] দক্ষিণ ভারতে শৈব ধর্মের সঙ্গে ভাগবত ধর্মকে এক করে দেখাবার আরো নিদর্শন আছে। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভাগবত রুদ্র-সম্প্রদায় যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিষ্ণুস্বামিন। তবে বর্তমানে সব দেবতাকেই ভক্তি সহকারে পূজা করা হলেও শিব-ভক্তির সাহিত্য পরিচয় খুব কমই পাওয়া যায়।

এই যে ভক্তি, এই ভক্তির যে উপাস্য দেবতা তাদের অস্তিত্ব নিয়ে বাস্তববাদীদের মনে নানা সন্দেহ থাকলেও বর্তমানের লেখকের মনে নেই।

১. **Religions of India—Hopkins. p. 488.**

বর্তমান লেখকের ধারণা সবই চিন্তাজাত। ব্যক্তিমানস সেই সার্বিক-মানসেরই অংশ মাত্র। সর্বত্রই মানসচিন্তা রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে পরমাত্মার নিজেরই বুকে—যে বুকের স্বভাব চিন্তাকে রূপে ধরে রাখা। সুতরাং কোন চিন্তাই ভ্রান্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দের' কথাই সত্য যখন নারদ বাল্মীকিকে বলেন, রামের প্রয়োজন নেই। তুমি যা লিখবে তাই সত্য :—

'যা রচিবে তাই সত্য তুমি।
কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

উপাস্য প্রেমের দেবতাকে কে কিভাবে দেখেছে কে জানে! বর্তমান লেখক ধ্যানকালে বহু ব্যক্তিগত উপাস্য দেবতাকে দেখেছেন। দেখেছেন যেন রক্ত মাংসের জীবের মত। চোখ বুঝলে এখনও দেখেন। হয়তো যাকে বলে ভ্রান্তিদর্শন, যাকে বলে hallucination তাই। যদি শঙ্করের দর্শন সত্য হয়, সবই তো মায়া। আমরাও তো মায়া মাত্র। কোন মহামানসের স্বপ্ন মাত্র। স্বপ্নের জীব যদি স্বপ্ন দেখে ক্ষতি কি? সেও তো সেই মহামানসেরই ইচ্ছা। কিন্তু বাস্তব অস্তিত্বকে যেমন বর্তমান লেখক অস্বীকার করেন না তেমনই করেন না আরাধকের উপাস্য দেব-দেবীকে। বর্তমান কোয়াণ্টাম ফিজিক্সের কথামত জগতের বিভিন্ন স্তর-মাত্রার স্তরভেদ মাত্র। ত্রিমাত্রিক জগতের জীব পঞ্চম মাত্রীয় জগৎকে হয়তো কল্পনা করতে পারেন না, তবে তা আছে। শুদ্ধা ভক্তি ভক্তের চেতনার মাত্রাকে যে মাত্রায় নিয়ে যায় সেখানে সে হয়তো বহুমাত্রিক চিত্র দেখে—তাঁকেই বলে ভগবৎ বা ভগবতী। তার যথার্থতা বিজ্ঞানেরই এখন সাধ্য নেই অস্বীকার করে। সবই তত্ত্বেও আছে, সত্যেও আছে। যে যে মাত্রা থেকে চিন্তা করে। উপাস্য দেবতা রূপেই থাকুন আর অরূপেই থাকুন তাঁর মানসক্রিয়া সদা ক্রিয়মান। তাঁর মানসনেত্র সদা জাগ্রত। তিনি দেখেন, দেখছেন, দেখবেন। আজ যে অবস্থায় আছি সেই জন্যই আছি, কাল যে অবস্থায় থাকব সেই জন্যই থাকব। অতীতে যে অবস্থায় ছিলাম

তাঁর জন্যই ছিলাম। আমাদের সুখ, আমাদের দুঃখ, বেদনা সবই মানস সত্তারই কারণে—যিনি অন্তরে বসে অন্তর্যামী হয়ে সব করেন। বিশ্বাস করলে বেদনাও হাসিতে উদ্ভাসিত হয়। আনন্দলীলার আনন্দে সিক্ত হয়ে ওঠে। সেই মহামানসের ইচ্ছায় সত্যিই পঙ্গুও দুর্লঙ্ঘ্য গিরি অতিক্রম করে, মূক কথা বলে। আমার মত সামান্য অধ্যাপক ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও দুষ্ট রাজনৈতিক মানসিকতাকে অস্বীকার করে গাড়ি করেই কলেজে যায়, যদিও মাথার উপর অনাহারের করাল দংষ্ট্রা ব্যাঘ্রদন্তের মত বিস্তৃত হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করলে এ দন্ত ব্যাদনাও আর থাকবে না। পিতা বা মাতা কি কখনও সন্তানকে ত্যাগ করেন? যথার্থ পিতা বা মাতা তা করেন না।

যারা অনাচারী, Cosmic dance-এ বিঘ্নসৃষ্টিকারী, সেই সব রাজনৈতিক নেতাদের বলছি, আপনারা লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী মানুষকে প্রতারণা করতে পারলেও চির জাগ্রত পরমাত্মার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি। শেষ বিধান তাঁরই হাতে, তাঁরই মহামানসের মধ্যে। সাবধান!

—

পরিশিষ্ট

অন্নপূর্ণা

15, Pen-Y-Groes,
Groes faem,
Nr. Pontyclun,
Mid Glamorgan

পরম শ্রদ্ধেয়,

বিজয়ার সম্ভাষণ জানিয়ে চিঠি লেখা আমার আরম্ভ। যদি বিরক্ত কোরে থাকি আপনাকে, নিজ গুণে আমায় ক্ষমা কোরবেন। সুদূর পশ্চিম প্রান্তের একটি ছোট্ট গ্রামে আমি বাস কোরি। অতপ্রত্যাশিত ভাবে আপনার লেখা—"সাধুসন্তের দেশে", "সহস্রারের পথে" ও "আত্মার রহস্য সন্ধান" পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়। বইগুলি বিজ্ঞান-সম্মত, যা অস্বীকার করা যায় না ও মনকে টেনে নিয়ে যায় কোনো এক অপরূপ অজানা রহস্যলোকে। যে অলৌকিক জগতের আকর্ষণ মানুষ যুগ যুগ ধরে অনুভব কোরেছে, কোরছে ও কোরবে আমিও তার থেকে বিচ্ছিন্না নই। আপনি শুধু লেখকই নন—তান্ত্রিক ও সাধক। আমার বুঝতে অসুবিধে হয় না আপনি নিজ গুণে সকলের প্রণম্য। আমিও মাথা নত কোরলাম। আপনার বই পোড়ে—আমি আপনার প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব কোরছি। কিছু মনে কোরবেন না আপনি কি আমায় যোগ শিক্ষা দিতে পারেন? আপনি এত দূরে, তাছাড়া আপনার ঠিকানাও আমার জানা নেই। অদূর ভবিষ্যতে কোলকাতায় যাবার কোনও ঠিক নেই।

তবে—প্রায় তিন চার বছর আগে কোলকাতাতেই আমার স্বামীর বন্ধু, আমাদের তাঁর গুরু শ্রীহরিহরানন্দের নির্দেশে অতি সহজ পদ্ধতিতে প্রাণায়াম বা যোগ শিক্ষা দেন। আমি কিছুদিন তা অভ্যাস কোরেও ছিলাম। আমার স্বামী ওসব বোঝেন না বা বিশ্বাসও করেন না। যোগ সম্পর্কে আমি যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর বইও পোড়েছি। কিন্তু আপনার লেখা বই—"সাধুসন্তের দেশে" বইটি পোড়ে—আমি চোখ বুজিয়ে দুই ভুরুর মাঝে-কূটস্থে মননিবেশ করে মনের দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব দিগন্তের পানে প্রসার করবার চেষ্টা আরম্ভ কোরেছি।

প্রথমেই আমি চোখ বুজলে লাল রং দেখি তারপর একটি সবুজ রংয়ের বৃত্ত (ring) ও তারমধ্যে একটি কাল spot ও আলোর বিন্দু। ওই আলোর বিন্দুতে মনোনিবেশ করার অল্পক্ষণ পরেই সমানে রং বদলাতে থাকে—লাল, সবুজ, বেগুনি (violet), নীল রংয়ের ভাগ কখনও বেশী হতে থাকে। আর এই নানান রংয়ের বৃত্ত ঘুরতে ঘুরতে ডান থেকে বাম আবার বামে থেকে ডানে আসে যায়। আপনার বইতে যেমন বর্ণনা আছে—কালো গর্তও দেখতে পাই, তবে সেটি 'blackhole' কিনা বুঝতে পারছি না, কারণ তার তীব্র আকর্ষণ অনুভব ঠিক কোরি না। মাঝে মাঝে আবার এখানকার fog-এর মত বা ধোঁওয়া ও তারমধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট আলোর বিন্দু ভেসে বেড়ায়। মনে হয় যেন বাগানে ছোট ছোট জোনাকির দল লুকোচুরি খেলায় মেতেছে। দৃষ্টিপটে তাদের আভাস ক্ষণস্থায়ী—একটু আলোর হাসি হেসে মিলিয়ে যায় ওই অপূর্ব রং-এর স্রোতে। আমার মন গেয়ে ওঠে "রং সাগরের তুফানে ওঠে মেতে"...। আমি আর কিছু দেখনি ও দেখিনা। প্রায় ১ থেকে ২ মাস হোলো এই যোগ অভ্যাসের চেষ্টা কোরছি, কিন্তু নিজেকে বা কোনও প্রতিবিম্ব যোগী ইত্যাদি দেখি না। আমি নিরাশ হয়ে পোড়ছি। আমার খুব ইচ্ছে করে আমার ৺গোপালের প্রতিবিম্ব দেখি। ওই দুষ্টু ৺গোপাল তাঁর ছোট্ট মাটির আবরণ সরিয়ে আমায় একবার দেখা কি দেবেন না! আমার মানস-গগন কি উৎভাসিত হয়ে উঠবে না তাঁর অমৃতময় স্পর্শে? কি জানি। শুনেছি আপনি নাকি অন্তর্যামী, দৈবজ্ঞ, হয়তো আপনিই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, যদি ইচ্ছা করেন, যদি আমার এ চিঠির উত্তর দেন দয়া কোরে। আমার এও মনে ইচ্ছে যে এই রং দেখা বোধকরি আমার মানসিক ভ্রান্তি ও সকলেই এরূপ দেখে বিনা আয়েসে। চোখ বুজলেই তো এরূপ রংয়ের প্রতিফলন দেখা যায়—কি জানি! এইজন্যই আপনাকে সাহস কোরে এই চিঠি লিখে ফেললাম। কিছু মনে কোরবেন না তো? তবে এই রংয়ের আকর্ষণও কিছু কম নয়। আমার তো বারবারই চোখ বুজিয়ে ধ্যান কোরতে ইচ্ছে করে। তবে সারাদিনের কাজের পরে রাতের নিস্তব্ধতাই আমার পক্ষে সুবিধে। মাঝে মাঝে অবশ্য সকালবেলাও চোখ বুঝিয়ে ধ্যান করার চেষ্টা করি। আপনার কাছ থেকে উত্তর পেলে সত্যই আনন্দ পাবো।

নমস্কারান্তে

মঞ্জুলা গাঙ্গুলি (Mrs.)

অন্নপূর্ণা

15, Pen-Y-Groes
Groes faen,
Nr. Pantyclun,
Mid. Glamorgan

পরম শ্রদ্ধেয়,

আপনি বোধহয় খুব ব্যস্ত তাই বোধহয় আমার চিঠির উত্তর দিয়ে উঠতে পারেন নি। আমি কিন্তু অধীর ব্যাকুলতা নিয়ে আপনার চিঠিব প্রতিক্ষায় আছি, ও আবার এই চিঠি লিখে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি। আপনি তো দৈবজ্ঞ, মহাযোগী। আমার মনের কথা আপনার কাছে অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। আমি আপনার কাছে যোগ শিক্ষা কোরতে চাই। তা কি কোরে সম্ভব হবে জানিনা। আমি এত দূরে থাকি, আর অদূর ভবিষ্যতে কোলকাতায় যাবার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। তার প্রধান কারণ দুটি—আমার স্বামীর অনিচ্ছা ও আমার শারীরিক অসুস্থতা। আমার স্বামীর শরীর তত ভাল নয়, আর কোলকাতায় গিয়ে আত্মীয়দের নানান ভাবে বিবাদের কারণ (litigations, harassment) ইত্যাদির জন্য ভয় পান। আমি plane-এ ওঠার আধ থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যাই। এটি হ'চ্ছে 1985 থেকে। Planeএ ওঠার অল্পক্ষণ পরে মাথা খুব ঘোরে, তারপর অজ্ঞান হয়ে যাই ও খুব বমি হয়, আমি উঠতেও পারি না। এই ঘটনাগুলির জন্য 1990 এর পরে কোলকাতায় আমরা আর যাইনি। বহু ডাক্তার দেখানো ও পরীক্ষা-নিরিক্ষা করা হয়েছে আমার এই অজ্ঞান হওয়ার জন্য। কিন্তু কিছু ধরা পড়েনি, ও এর কারণ আমার কাছেও অজ্ঞাত। এটা physical না mental তাও জানিনা। তবে আমার বিশ্বাস আপনি আশীর্বাদ কোরলে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।

আপনাকে গত চিঠিতে লিখেছিলাম যে আপনার লেখা বই—"সহস্রারের পথে" "সাধুসন্তের দেশে" ও "আত্মার রহস্য সন্ধানে" পড়ে যোগ অভ্যাস বা কূটস্থে মন দিয়ে ধ্যানের চেষ্টা করি রোজ। কিছুদিন থেকে আমি চোখ বুজে ও খালি চোখেও দেখি ধোঁওয়া ও কুয়াশার কিছু ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরছে, তারমধ্যে আবার অসংখ্য আলোক বিন্দু। আলোক বিন্দুগুলির নানা রঙের—সোনালি, সবুজ, লাল বেগুনি, নীল রংয়ের প্রতিফলন দেখছি। আমার ঘরের cream colour দেওয়ালে

আলো, ছায়ার আলিম্পনে আঁকা হয়ে যায় সমানেই। আবার ওই আণবিক আলোর বিন্দুগুলি দ্রুত গতিতে ঘুরতে ঘুরতে বড় হতে থাকে, কখনও কাছে আসে, কখনও দূরে সরে যায়। কিন্তু এর অপ্রতিহত সঞ্চরণ, গতি আমি অবাক হয়ে দেখি। A lots of little blobs of lights are shinny and alive ! আবার কদিন থেকে দেওয়ালে নানান আকৃতিও দেখছি। একদিন দেখলাম মনে হোলো ৺রাম ৺সীতামা, তারপর ৺রাধাকৃষ্ণ, মা দুর্গা (শুধু মুখটি), মানুষের মুখ দেওয়ালে ভেসে বেড়াচ্ছে। গতকাল বেশ বড় পাখীর ছায়া ও তার পিছনে '?' একটি আলোক চিহ্ন। আজকে দুপুরে ধ্যান করার পরে—বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম কোরছিলাম—হঠাৎ দেখি আস্তে আস্তে দুটি যোগীর অবয়ব যেন ফুটে উঠলো। আমার গা কেমন ছমছম কোরে উঠলো। ভয়ের কারণ কি আছে ? একি আমার মানসিক বিকার না, চোখটাই খারাপ হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। প্রতি রাতে এক প্রকারে ছোট ছোট অদৃশ্য প্রাণী বা পোকা সারা ঘর ভরিয়ে ফেলে, ও সবুজ, লাল ও বেগুনী আলো বিস্তার কোরে বেড়ায়। আমি খোলা চোখেই দেখি এরা আমার গায়ে এসে পোড়ছে ! আমি যোগ অভ্যাস কোরতে চেয়েছি যাতে আমার ৺গোপাল, শ্রীকৃষ্ণকে মানস দৃষ্টিতে দেখতে পাই, তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি কোরতে পারি আমারই মধ্যে। কিছুটা ভবিষ্যতের দিনগুলো আমার দৃষ্টিপথে বা উপলব্ধিতে ভেসে উঠুক এই আমার চাওয়া শুধু। আমার সন্তানহীন জীবনে ৺গোপালকে আমি যেন জীবনে, মরণে, অসহায় অবস্থায়, সব সময় কাছে পাই এইটুকুই আমার কামনা ও প্রার্থনা। জানি না তা কোনও দিনও পূরণ হবে কিনা। আপনাকে আমি তাই স্মরণ কোরেছি সব সময় এই আশা নিয়ে যে আপনি আমায় পথ দেখাবেন। তা আজও আপনার কাছ থেকে আমি কোনও চিঠি পেলাম না। আপনি হয়তো খুব ব্যস্ত। উচ্চস্তরের সাধক আপনি, আমার মতো সাধারণ একজনের ডাকে সাড়া দেবার সময় বা ইচ্ছাও হয়তো নেই। আপনি আমার চিঠিও হয়তো পাননি। যদি এই চিঠি পান, দয়া কোরে আপনার কোনও শিষ্যকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরতে বললে, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। কোলকাতায় আমি যদি থাকতাম তাহোলে ঠিক খুঁজে খুঁজে আপনার সঙ্গে দেখা কোরতাম। কিন্তু আমি এত দূরে, আর অদূর ভবিষ্যতে কোলকাতায় যাবার ঠিক নেই। আপনার দর্শন লাভের জন্য আমি ব্যাকুল। কারণ তো আপনি জানেনই। আর এই যে ছোট ছোট আণবীক জীব আসছে মনে হয় space থেকে এদের আগমন কি করে বন্ধ করি ? আপনাকে আমার প্রণাম জানিয়ে শেষ করি।

মঞ্জুলা